হেদায়া

كتاب القسمة

অধ্যায় ও বন্টনের মাসাইল

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القسمة

অধ্যায় ও বন্টনের মাসাইল গ্রন্থকার বলেন: যৌথ মালিকানাধীন ইজমালী বস্তু বন্টন করা শরী'আত অনুমোদিত। কেননা, নবী করীম (স) গনীমতের মাল এবং উত্তরাধিকার সম্পদে বন্টনকর্ম সম্পাদন করেছেন। অধিকন্তু এ বন্টনকর্ম কোনরূপ আপত্তি ছাড়াই যুগযুগ ধরে চলে আসছে। সর্বোপরি এতে বিনিময়ের অর্থও বিদ্যমান রয়েছে। কেননা, দুইজন অংশীদার ব্যক্তির কোন একজনের ভাগে যে অংশ আছে, এর কিছু অংশ তো তার এবং অপর কিছু অংশ তার সাথীর। সে এ অংশটি গ্রহণ করেছে ঐ অংশের পরিবর্তে, যা তার সাথীর ভাগে তার অংশ থেকে রয়েছে। কাজেই এতে বিনিময়ের অর্থও নিহিত রয়েছে। পরিমাপযোগ্য এবং ওযনযোগ্য বস্তুতে কোনরূপ তফাৎ না থাকায় তাতে পৃথক করার অর্থই স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ কারণেই এ জাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে দুই অংশীদারের একজন অপর জনের অনুপস্থিতিতে নিজের অংশ বুঝে নিতে পারে।

। যদি দুই ব্যক্তি যৌথভাবে কোন বস্তু খরীদ করে পরে তা বন্টন করে নেয় তবে তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশ (পূর্ণমূল্য হতে) অর্ধ মূল্যের বিনিময়ে মুরাবাহার (লাভের) ভিত্তিতে লাভে বিক্রি করতে পারবে।

যেহেতু জীব জানোয়ার এবং আসবাব পত্রের মধ্যে পরস্পর ব্যবধান বিদ্যমান, এ কারণে এ সবের ক্ষেত্রে বিনিময়ের অর্থটি স্পষ্ট। আর এ কারণেই অংশীদারদের এক জন অপর জনের অনুপস্থিতিতে নিজ অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। যদি (তারা) দুই জন মিলে কোন কিছু খরীদ করার পর তা বন্টন করে নেয়, এ বন্টনের পর তাদের কেউই নিজ নিজ অংশ মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রয় করতে পারবে না। কিন্তু যদি ঐ জীব- জানোয়ারগুলো একই প্রজাতির হয়, তাহলে শরীকদের কোন একজনের বন্টন কামনা করার সময় বিচারক তা বন্টন করে দেওয়ার জন্য (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে) বাধ্য করবে। কেননা, উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার কারণে এগুলোর মধ্যে পৃথক করার অর্থও বিদ্যমান আছে। আর । বা বিনিময়ের বিষয়টি এমন, যাতে বল প্রয়োগের বিষয়টি প্রযোজ্য হয়। যেমনিভাবে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে বল প্রয়োগের বিষয়টি প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

। বন্টনের জন্য বিচারক এ কারণেই বাধ্য করবে যে, শরীকদের কোন একজন বন্টন কামনা করে বিচারকের নিকট মূলত: এ দাবীই করছে যে, বিচারক যেন তার অংশ দ্বারা তাকেই উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দেন এবং তার মালিকানাধীন সম্পত্তি দ্বারা অন্যের লাভালাভ হাসিল করার ক্ষেত্রে যেন বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। অতএব বিচারকের জন্য অপরিহার্য হলো তার দাবী মঞ্জুর করা ।।

পক্ষান্তরে, জীব-জানোয়ার গুলো যদি বিভিন্ন প্রজাতির হয়, তাহলে এ সবের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান থাকায় (বন্টনে) সমতা বিধান করা অসম্ভব হওয়ার কারণে, বিচারক বন্টনের ব্যাপারে বিবাদী পক্ষকে বাধ্য করবে না। যদি অংশীদার সকলেই বন্টনের ব্যাপারে রাযী থাকে তবে বন্টন করা জাইয হবে। কেননা, হক(পাওনা) তাদেরই। | ইমাম কুদূরী বলেন : বিচারকের জন্য সমীচীন হলো (স্বাধীন ভাবে) একজন বন্টনকারী (আমীন) নিয়োগ করা। বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় ধনাগার) থেকে তার জীবিকার ব্যবস্থা করা হবে এবং সে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা ব্যতিরেকে মানুষের বন্টন কার্য সম্পাদন করে দেবে। কেননা, এটি আদালতের সাথেই সম্পর্কিত একটি কাজ, যেহেতু এর দ্বারা পরস্পরের ঝগড়া-বিবাদ নির্মূল হয়। এ হিসাবে বন্টনকারীর জীবিকার বিষয়টি বিচারকের জীবিকার মতই হলো। কাজেই বিচারকের ন্যায় তার জন্যও বায়তুল মাল থেকে জীবিকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। দ্বিতীয়ত: বন্টনকারী নিয়োগ করার উপকার জনসাধারণ সকলেই ভোগ করে থাকে। কাজেই জন সাধারণের মাল থেকেই তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করতে হবে, 'লাভ হিসাবে জরিমানা এ বিধান বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে। | ইমাম কুদূরী বলেন: বিচারক যদি (সরকারীভাবে) কোন বন্টনকারী নিয়োগ না করে, তবে সে এমনভাবে একজন বন্টনকারী নিয়োগ করবে, যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বন্টন কার্য সম্পাদন করবে। এর অর্থ হলো : যারা বন্টন করাবে, এ পারিশ্রমিকের দায়-দায়িত্ব তাদের উপরই বর্তাবে। কেননা, এতে উপকার তো বিশেষভাবে তাদেরই হচ্ছে। বিচারক তার জন্য স্বাভাবিক পারিশ্রমিক সাব্যস্ত করে দেবেন, যাতে সে (সরকারী লোক হওয়ার সুযোগে) অধিক পারিশ্রমিক গ্রহণ করে যুলম করার সুযোগ না পায়। তবে উত্তম হলো : বায়তুল মাল হতে তার জীবিকার ব্যবস্থা করা। কেননা, এটাই মানুষের জন্য সহজ ব্যবস্থা এবং তার অপবাদ থেকে দূরে থাকার উপায়।

। বন্টনকারী ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য হলো ঃ (১) ন্যায়পরায়ণ (২) আমানতদার (৩) এবং বন্টন সম্পর্কে প্রাজ্ঞ হওয়া। কেননা, এটিও বিচার ব্যবস্থার অনুরূপ একটি কাজ। অধিকন্তু এ কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য কুদরত তথা ক্ষমতাবান হওয়া আবশ্যক। আর তা হাসিল হয় এ সম্পর্কিত ইলমের(জ্ঞানের) দ্বারা। অনুরূপভাবে এ কাজের জন্য ১. হাদীসেও এ কথা উল্লেখ রয়েছে যে,5L১ - লাভ হিসাবেই জরিমানা তথা দায়িত্ব আপতিত হয়ে

থাকে। কাজেই যাদের লাভ হবে 'তাদেরই এর ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

অধ্যায় ও বন্টনের মাসাইল

তার নির্ভরযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য হওয়াও আবশ্যক। আর তা হাসিল হয় আমানতদারীর মাধ্যমে।

বিচারক এক বন্টনকারীকে মেনে নেওয়ার জন্য লোকদেরকে বাধ্য করতে পারবে না। এর অর্থ হলো : বিচারক লোকদেরকে এ ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না যে, তারা যেন তাকেই এ কাজের জন্য শ্রম বিনিয়োগকারী বলে সাব্যস্ত করে। কেননা, আকদের ব্যাপারে বল প্রয়োগ জাইয নয় । অধিকন্তু যদি এক ব্যক্তিকেই বন্টনকারী মনোনীত করা হয়, তাহলে সে স্বাভাবিক পারিশ্রমিক হতে অধিক পারিশ্রমিক গ্রহণ করে লোকদের প্রতি যুলম করবে ।

। যদি অংশীদারগণ একমত হয়ে নিজেদের সম্পত্তি নিজেরা পরস্পর বন্টন করে নেয়, তাহলে তা জাইয আছে। কিন্তু যদি অংশীদারদের মধ্যে কোন নাবালক বাচ্চা থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রে বিচারক বা আদালতের ফয়সালা আবশ্যক হবে। কেননা, তাদের (অংশীদারদের) তার (নাবালকের) উপর কোন কর্তৃত্ব নেই।

ইমাম কুদূরী বলেন : বন্টনকারীদেরকে এ সুযোগ দেওয়া যাবে না যে, তারা সকলে একত্রে মিলে বন্টন কার্য সম্পাদন করবে, যাতে তাদের পারস্পরিক ঐক্যমতের কারণে পারিশ্রমিকের বিষয়টি অত্যধিক বৃদ্ধি না পেয়ে যায়। অবশ্য যদি বন্টনকারীগণ পরস্পর ঐক্যবদ্ধ না থাকে, তাহলে বন্টন কার্য হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশংকায় তারা প্রত্যেকেই কাজ হাসিলের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করবে। ফলে পারিশ্রমিক সস্তা হবে।

। ইমাম কুদূরী বলেন : বন্টনের পারিশ্রমিক মাথা পিছু হারে ধার্য হবে, ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে প্রত্যেক্যের ভাগ অনুসারে তা সাব্যস্ত হবে। কেননা, এটি হচ্ছে মালিকানার ব্যয় । কাজেই তা মালিকানা হিসাবেই সাব্যস্ত হবে। যেমন কয়াল-ওযনদাতার খরচা, যৌথ কুপ খনন করার ব্যয় এবং যৌথ মালিকানাধীন গোলামের খরচা ইত্যাদি (মালিকানা হিসাবেই সাব্যস্ত হয়)।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল হলো : পারিশ্রমিক দিতে হয় মালামাল পৃথক করার দরুন। আর এ পৃথক করণের বিষয়টিতে কোন তফাৎ নেই। অনেক সময় স্বল্প মালের প্রতি নযর রাখা কঠিন বিষয় হয়ে পড়ে। আবার কখনো বিপরীতও হয়ে থাকে। বস্তুত: কম-বেশীর বিষয়টি হিসাবে আনা খুবই দুস্কর ব্যাপার। কাজেই মালামাল পৃথক করণের সাথেই মূল হুকুম সম্পর্কিত হবে ।১ কূপ খননের বিষয়টি এর থেকে ভিন্ন। কেননা, সেখানে পারিশ্রমিক দিতে হয় মাটি স্থানান্তরিত করার কারণে। আর এতে বেশ-কম হয়ে থাকে। কাজেই কূপ খননের বিষয়ের উপর আলোচ্য মাসআলাকে কিয়াস করা যাবে না।)

১. আর এ বিষয়টিতে যেহেতু কম-বেশীর কারণে কোন ব্যবধান হয় না, তাই বন্টনের পারিশ্রমিক গণি হারেই পরিশোধ করতে হবে ।

আল-হিদায়া

। কয়ালী ও ওযন করা যদি বন্টনের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তবে ফকীহদের এতে অনুরূপ মতানৈক্য বিদ্যমান রয়েছে। আর যদি এ কাজ বন্টনের জন্য না হয়ে থাকে, তাহলে পারিশ্রমিক দিতে হবে কয়ালী ও ওযন করার বিনিময়ে। আর এ কাজের মধ্যে কম-বেশী হয়ে থাকে। (কাজেই পারিশ্রমিকের মধ্যেও কম-বেশী হবে।) কিন্তু যদি বিষয়টি স্পষ্ট না বলে সাধারণভাবে বর্ণনা করে, তবে এটি হবে একটি ওযর।

ইমাম আবু হানীফা (র) হতে বর্ণিত আছে যে, বন্টনকারীর পারিশ্রমিক যে বন্টন করে নিতে চায়, তার উপর বর্তাবে, বন্টন অস্বীকারকারীর উপর বর্তাবে না। কেননা, এতে লাভ হলো তার, যে বন্টন করে নিতে চায় আর লোকসান হলো, অস্বীকার কারীর ।২ । ইমাম কুদূরী বলেন : যদি অংশীদারদের সকলে বিচারকের আদালতে হাযির হয় এবং বাড়ী বা জমি তাদের মালিকানায় থাকে, আর তারা এ মর্মে দাবী করে যে, তারা অমুক থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এ সম্পত্তির মালিক হয়েছে, (এখন তারা এ সম্পত্তি ভাগ করে নিতে চায় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে, বিচারক (তাদেরকে) এ সম্পত্তি ততক্ষণ পর্যন্ত বন্টন করে দেবেন না, যতক্ষণ না তারা উক্ত ব্যক্তির মারা যাওয়া এবং ওয়ারিশদের সংখ্যা কত, এ ব্যাপারে-সাক্ষী প্রমাণ পেশ করবে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে, বিচারক তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে উক্ত সম্পত্তি বন্টন করে দেবেন এবং তিনি বন্টন নামায় এ কথা উল্লেখ করে দেবেন যে, তিনি তাদের সকলের কথা মতই এ বন্টন কার্য সম্পাদন করেছেন। । যদি এ যৌথ সম্পত্তি জমি না হয়ে অন্য কোন মালামাল হয় এবং তারা দাবী করে যে, তারা মীরাস সূত্রে এ মালামাল প্রাপ্ত হয়েছে, তাহলে ইমামত্রয়ের সকলের মতে বিচারক তাদের দাবীর প্রেক্ষিতে তাদের এ মালামাল বন্টন করে দেবেন। আর যদি জমির ব্যাপারে অংশীদারগণ দাবী করে যে, তারা খরীদ সূত্রে এ সম্পত্তির মালিক হয়েছে, তাহলেও বিচারক তাদের দাবীর প্রেক্ষিতে এ জমি বন্টন করে দেবেন।

। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর যুক্তি এবং দলীল হলো এই যে, কব তথা দখল হচ্ছে মালিকানার দলীল এবং স্বীকারোক্তি হচ্ছে সত্যতার আলামত। আর তাদের যেহেতু কোন প্রতিপক্ষও নেই, কাজেই বিচারক তাদের মাঝে ঐ সম্পত্তি বন্টন করে দেবেন। যেমন, উক্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অস্থাবর সম্পত্তি এবং খরীদকৃত

জমির ক্ষেত্রে করে থাকেন। (এ ক্ষে চনি ক্ষেত্রে কনে থাকেন। এ ক্ষেত্রে--সাক্ষী প্রমাণের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। এটা এ কারণে যে,তাদের বক্তব্যের (বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী ও তা অস্বীকারকারী কেউ ১. আর ঐ ওযরের কারণেই মালিকানা অনুপাতে কয়াল ও ওযনকারীকে পারিশ্রমিক প্রদানের কম দেওয়া হয়েছে।

এ গুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি অংশীদারদের কেউ বন্টন করে নিতে চায় এবং অপরাপর ব্যক্তিগণ বন্টনের ব্যাপারে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে। যদি অংশীদারদের সকলেই বন্টনের দাবী করে, তাহলে স্মানভাবে সকলের উপরই পারিশ্রমিক প্রদানের দায়িত্ব বর্তাবে।

অধ্যায় : বন্টনের মাসাইল।

নেই। অথচ অস্বীকারকারীর উপরই কেবলমাত্র স্বাক্ষী-প্রমাণ পেশ করা অপরিহার্য হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে যেহেতু কোন অস্বীকারকারী নেই, অতএব সাক্ষী-প্রমাণ পেশ করাতে কোন ফায়দা নেই। তবে বিচারক বন্টননামায় এ কথা লিখে দেবেন যে, তিনি তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে এ বন্টন কার্য সম্পাদন করেছেন, যাতে বন্টনের বিষয়টি তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাদের থেকে যেন অন্যদের পর্যন্ত সম্প্রসারিত না হয়। | আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, বন্টনের অর্থ হলো : মৃত ব্যক্তির উপর ফয়সালা জারি করা। কেননা, বন্টনের পূর্ব পর্যন্ত (মৃত ব্যক্তির) পরিত্যাজ্য সম্পদ তার মালিকানায়ই থাকে। এ কারণেই (এ অবস্থায়) এর থেকে যদি কোন কিছু নতুন ভাবে বর্ধিত হয়, তাহলে এ বর্ধিত অংশেও মৃত ব্যক্তির অসিয়ত কার্যকর হবে এবং এর দ্বারাও তার ঋণ পরিশোধ করা যাবে।

অবশ্য বন্টনের পরবর্তী অবস্থা এ হুকম থেকে ব্যতিক্রম। মোদ্দা কথা হলো : বন্টন করার অর্থ ব্যক্তির উপর রায় বা ফয়সালা জারি করা। আর স্বীকারোক্তি এ ক্ষেত্রে গ্রহণীয় কোন দলীল নয়। কাজেই সাক্ষী-প্রমাণ আবশ্যক।

উল্লেখ্য যে, এ সাক্ষী-প্রমাণ(কোন অহেতুক বিষয় নয়, বরং এটি একটি উপকারী বিষয়ও বটে। কেননা, (প্রয়োজনে ওয়ারিসদের কোন এক জনকে মৃত (মুরিস) ব্যক্তির বিবাদী নির্ধারণ করাও হতে পারে, আর তার স্বীকারোক্তির কারণে এটি নিষিদ্ধও হবে

। যেমন (মৃত ব্যক্তির) ওয়ারিস বা অসিয়্যত কার্যকরী করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি ঋণের কথা স্বীকার করে, তাহলে তার স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও তার সামনে তার বিপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।২।

অস্থাবর সম্পদের বিষয়টি এ হুমুমের ব্যতিক্রম। কেননা, এ জাতীয় সম্পদ বন্টনের মধ্যে এগুলোর হিফাযতের বিষয়টিই লক্ষণীয় হয়ে থাকে। আর জমি তো নিজে নিজেই সংরক্ষিত। (কাজেই অস্থাবর সম্পদের উপর জমির বিষয়কে কিয়াস করা যাবে না।) অধিকন্তু অস্থাবর সম্পদ যার দখলে থাকবে, সেই এর যামিন হবে। কিন্তু জমির বিষয়টি ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে এমন নয়। অনুরূপভাবে খরীদকৃত জমির বিষয়টিও এর থেকে ব্যক্তিক্রম। কেননা, বিক্রীত জমি বন্টন না হলেও তা বিক্রেতার মালিকানায় থাকে না। তাই তা বন্টনের কারণে অন্যের উপর ফয়সালা জারী করা অপরিহার্য হয় না। ১. আর এ ফয়সালা জারী করার জন্য গ্রহণযোগ্য দলীল-প্রমাণ আবশ্যক। এ পর্যায়ে শুধু স্বীকারোক্তি যথেষ্ট

নয়। কেননা, এটি একটি অসম্পূর্ণ প্রমাণ (**৪এ**) কাজেই মৃত ব্যক্তির উপর কোন রায় জারী

করতে হলে সাক্ষী-প্রমাণ ব্যতিরেকে তা করা যাবে না। ২. সাহেবায়নের যুক্তিতে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছিল যে, সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করাতে এখানে কোন ফায়দা

নেই। এর জবাবে ইমাম আবু হানীফা (র) এর পক্ষ হতে বলা হচ্ছে যে, এটি কোন অহেতুক কাজ নয়; বরং এটি একটি উপকারী কাজ। কেননা, উপরোক্ত অবস্থায় অংশীদারদের কোন একজনকে মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধি মাননানীত করা হবে, আর অপর ব্যক্তিকে তার মুকাবিলায় বিবাদী হিসাবে গণ্য করা হবে। তখনই বিচারকের পক্ষে ফয়সালা দেওয়া সম্ভব হবে। উল্লেখ্য যে, তাদের স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও তারা বাদী বিবাদী হতে পারবে। যেমন মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ ও অসীর স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও তাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। কাজেই এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে।

আল-হিদায়া

ইমাম কুদূরী বলেন : যদি অংশীদারগণ আদালতে উপস্থিত হয়ে মালিকানা দাবী করে, কিন্তু কিভাবে এ সম্পত্তি তাদের মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়ে এসেছে, তা উল্লেখ না করে তাহলেও বিচারক এ সম্পত্তি তাদের মধ্যে বন্টন করে দেবেন। কেননা, এ জাতীয় সম্পত্তি বন্টন করা দ্বারা অন্যের উপর ফয়সালা জারী করা হয় না। (এ ক্ষেত্রে) তারা অন্যের জন্য মালিকানার স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেনি।

গ্রন্থকার বলেন : এটি মাবসূত' গ্রন্থের বন্টন অধ্যায়ের একটি বর্ণনা।

জামে সগীর' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এক খণ্ড জমি—দুই ব্যক্তি এসে এর মালিকানা দাবী করলো এবং তারা এ ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণও কায়েম করলো। আর তা তাদের দখলেও আছে। এমতাবস্থায় তারা যদি এ জমিটি বন্টন করে নিতে চায়, তাহলে “এ জমিটি তাদের”—এ ব্যাপারে তারা সাক্ষ্য-প্রমাণ কায়েম না করা পর্যন্ত বিচারক জমিটি তাদের মাঝে বন্টন করে দেবেন না। কেননা, এখানে সম্ভাবনা রয়েছে যে, এ জমিটি তাদের নয়, বরং অন্য মানুষের। বলা হয়, এটি শুধুমাত্র ইমাম আবু হানীফা (র) এর অভিমত। কেউ কেউ বলেন : এটি সকলেরই অভিমত। আর এ কথাটিই অধিকতর বিশুদ্ধ । কেননা, জমির ক্ষেত্রে হিফাযতের জন্য তা বন্টনের কোন প্রয়োজন নেই। আর মালিকানা বন্টনের জন্য মালিকানা বাকী বা প্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক। অথচ এখানে প্রতিষ্ঠিত কোন মালিকানা নেই। কাজেই উক্ত জমি বন্টন করা যাবে না ।

ইমাম কুদূরী বলেন : যদি দুই ওয়ারিস ব্যক্তি (আদালতে) হাযির হয়ে মুরিস (যার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছে) ব্যক্তির মৃত্যু এবং ওয়ারিসদের সংখ্যা নিরূপণ করে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেল এবং বাড়ীটিও তাদের দখলে থাকে, এমতা বস্থায়(এ সম্পত্তির তৃতীয় কোন ওয়ারিস যদি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে উপস্থিত লোকদের বন্টনের দাবীর ভিত্তিতে বিচারক ঐ জমিটি তাদের মধ্যে বন্টন করে দেবেন। এ পর্যায়ে বিচারক কোন এক ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করবেন, সে ঐ অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশটি বুঝে নেবে। অনুরূপভাবে যদি অনুপস্থিত ব্যক্তির পরিবর্তে কোন নাবালিকা সন্তান ওয়ারিস হয়, (আর মাসআলা পূর্ববৎ হয়), তাহলে বিচারক জমিটি বন্টন করে দেবেন। তবে এ ক্ষেত্রে তিনি একজনকে অসী নিয়োগ করবেন, সে এ নাবালকের অংশটি বুঝে (দখল করে নেবে। কেননা

এতে অনুপস্থিত ব্যক্তি এবং নাবালকের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ নিহিত রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে উপরোক্ত অবস্থায়ও সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ আবশ্যক। কিন্তু সাহেবায়ন এতে ভিন্ন মত পোষণ করেন। যেমন আমরা এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করেছি । যদি বন্টনপ্রার্থী ক্রেতাদের মধ্যে দুই ব্যক্তি উপস্থিত হয়, তবে তাদের তৃতীয় (ক্রেতা) জন অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় বিচারক জমিটি বন্টন করবেন না ।

উক্ত মাসআলা দুটির মধ্যে পার্থক্যের মূল কারণ হলো এই যে, ওয়ারিস ব্যক্তির মালিকানা প্রতিনিধিত্বমূলক মালিকানা ! এ কারণেই মুরিস যদি কোন কিছু খরীদ করে (মারা যায়) এবং এতে যদি কোন ত্রুটি পাওয়া যায়, তবে ওয়ারিস তা (বিক্রেতার নিকট) ফেরৎ দিতে পারবে। আর সে যদি কোন কিছু বিক্রি করে (মারা যায়), তাহলে ওয়ারিস ব্যক্তির নিকট তা ফেরৎ দেওয়া যাবে। অধিকন্তু মুরিস ব্যক্তির শরীদের কারণে ওয়ারিস ব্যক্তি কখনো প্রতারিত হয়।

এ পর্যায়ে ওয়ারিসদের কোন একজন মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে তার হাতে যে মাল আছে, এর ব্যাপারে, এক পক্ষ হবে এবং অপর ব্যক্তি নিজের পক্ষ হতে দ্বিতীয় পক্ষ হবে। পরিণামে এ বন্টন বাদী-বিবাদী উভয়ের সামনে ফয়সালা করার অনুরূপ বলে ধর্তব্য হবে।

বস্তুত: খরীদ করার মাধ্যমে যে মালিকানা হাসিল হয়, তা নুতন ধরনের মালিকানা। এ কারণেই খরীদকৃত মালে কোন ত্রুটি পাওয়া গেলে ক্রেতা তা বিক্রেতার নিকট ফেরৎ দিতে পারে না। অতএব উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির তরফ হতে পক্ষ হতে পারবে না। এতেই উভয় মাসআলার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

জমি যদি অনুপস্থিত ওয়ারিসের দখলে থাকে অথবা জমির কিয়দংশ যদি উক্ত ব্যক্তির দখলে থাকে, তাহলে বিচারক এ জমি বন্টন করতে পারেন না। অনুরূপভাবে এ সম্পত্তি যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি কর্তৃক রক্ষিত আমানতদার ব্যক্তির থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। এমনিভাবে এ সম্পত্তি যদি নাবালকের কাছে থাকে, তাহলেও উক্ত হুকুম হবে। (অর্থাৎ তা বন্টন করা যাবে না। কেননা যেহেতু এ সম্পদ অনুপস্থিত ব্যক্তি এবং নাবালকের দখলে আছে, তাই (এ অবস্থায় যদি তা বন্টন করা হয়, তাহলে) এ বন্টন তাদের উপর সম্পাদিত হবে এমন অবস্থায়, যখন তাদের তরফ থেকে কোন পক্ষ উপস্থিত নেই। (অথচ এভাবে বন্টন করা জাইয নয়।) উল্লেখ্য যে, বিপক্ষের আমীন (আমানতদার ব্যক্তি) তার পক্ষ হতে তার উপর অধিকারের দাবী করার ক্ষেত্রে বিবাদী হতে পারবে না। অথচ বিবাদীর ১. যেমন মুরিস ব্যক্তি কোন দাসী খরীদ করে পরে মারা গেল। এরপর ওয়ারিস ব্যক্তি তাকে উম্মে ওয়ালাদ | (সন্তানের মা) বানিয়ে নিল । এরপর অপর কোন ব্যক্তি এ দাসীর মালিকানা দাবী করলো। এ অবস্থায় সন্তানটি আযাদ গণ্য হবে এবং ওয়ারিসের উপর ওয়াজিব হবে পাওনাদার ব্যক্তিকে বাচ্চার মূল্য পরিশোধ করা এবং দাসীকে মহর প্রদান করা। তারপর ওয়ারিস ব্যক্তি বিক্রেতার নিকট থেকে বাচ্চার দাম ও দাসীর মূল্য ফেরৎ নিয়ে নেবে, মহর ফেরং নিতে পারবে না। মুরিস নিজে জীবিত থাকলে তার ক্ষেত্রেও অনুরুপ বিধান প্রযোজ্য হতো। এ পর্যালোচনার দ্বারা এ কথা প্রতিভাত হচ্ছে যে, ওয়ারিসের মালিকানা হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক মালিকানা। কাজেই এ অবস্থায় অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর ফয়সালা কর! অপরিহার্য হয় না । আর খরীদ করার মাধ্যমে যে মালিকানা হাসিল করা হয়েছে, এর বিষয়টি পূর্বোক্ত মাসআলা থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, এটি প্রতিনিধিত্বমূলক মালিকানা নয়, বরং এটি নুতন একটি মালিকানা। এ কারণেই ক্রেতা যদি খরীদকৃত মালে কোন ত্রুটি দেখতে পায়, তাহলে সে তা বিক্রেতার নিকট তো ফেরৎ দিতে পারবে; কিন্তু বিক্রেতা বিক্রেতার নিকট ফেরৎ দিতে পারবে না। কেননা এ অবস্থায় অনুপস্থিত বাতিল উপর ফয়সালা করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

উপস্থিতি ব্যতিরেকে ফয়সালা দেওয়া জাইয নয়। এ মাসআলার ক্ষেত্রে সাক্ষী-প্রমাণ কায়েম করা ও না করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এটিই সহীহ অভিমত। যেমন কিতাবে (জামে সগীর গ্রন্থ) বিষয়টিকে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ যদি কেবলমাত্র একজন ওয়ারিস হাযির হয় (এবং বন্টনের দাবী করে), তবে বিচারক জমিটি বন্টন করে দেবেন না। যদিও সে এ বিষয়ে (প্রয়োজনীয়) সাক্ষী-প্রমাণ পেশ করে। কেননা, ফয়সালার জন্য বাদী-বিবাদী উভয়ের উপস্থিতি জরুরী। কারণ, একই ব্যক্তি বাদী আবার, বিবাদী উভয়টি হতে পারে না। এমনিভাবে একই ব্যক্তি মুকাসিম (বন্টনের দাবীদার) এবং মুকসাম (যার থেকে বন্টন করে নেওয়া হবে) হতে পারে না। কিন্তু যদি উপস্থিত ব্যক্তির সংখ্যা দুই হয়, তবে এর হুকুম ভিন্নতর হবে, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

যদি দুইজন ওয়ারিস হাযির হয় এবং তাদের একজন নাবালক হয় এবং অপরজন সাবালক হয়, তবে বিচারক নাবালকের পক্ষে একজনকে অসী নিয়োগ করবেন এবং সাক্ষী-প্রমাণ কায়েম করার পর তিনি তাদের দাবীমত জমিটি বন্টন করে দেবেন। অনুরূপভাবে যদি একজন সাবালক ওয়ারিস এবং ; ।L (যার জন্য ঐ বাড়ীর এক তৃতীয়াংশের ব্যাপারে অসিয়ত করা হয়েছে) হাযির হয়ে বন্টন দাবী করে, আর তারা মীরাস ও অসিয়্যতের বিষয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণও কায়েম করে, তাহলে বিচারক তাদের দাবী অনুযায়ী বাড়ীটি বন্টন করে দেবেন, (বাদী-বিবাদী উভয়ের উপস্থিতির কারণে) সাবালক ব্যক্তি তো মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে এবং যার জন্য অসিয়ত করা হয়েছে সে হবে নিজের পক্ষ হতে । এমনিভাবে নাবলকের পক্ষে অসী নিয়োগ করা অবস্থায়ও বন্টন করা যাবে। কেননা অসী যেহেতু নাবলকের প্রতিনিধি, তাই যেন নাবালক/সাবালক হওয়ায় নিজেই আদালতে উপস্থিত আছে।

পরিচ্ছেদ : যে যে জিনিস বন্টন করা যাবে এবং যে যে জিনিস বন্টন করা যাবে না

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : যদি (একাধিক) অংশীদারদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশ দ্বারা ফায়দা হাসিল করতে সক্ষম হয়, তাহলে বিচারক অংশীদারদের কোন একজনের দাবীর প্রেক্ষিতে জমিটি বন্টন করে দিতে পারবেন। (যদিও অপর অংশীদার তা অস্বীকার করে)। কেননা, যে যে ক্ষেত্রে বন্টনের বিষয়ে অংশীদারদের ১. কেননা আমানতদার ব্যক্তি তো মালের হিফাযতের যিম্মাদার। বিবাদী হয়ে অন্যের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। কাজেই সে বিবাদী হতে পারবে না। এতদসত্বেও ফয়সালা দেওয়া হলে, এ ফয়সালা বিবাদীর উপস্থিতি ব্যতিরেকে দেওয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে। অথচ এভাবে ফয়সলা করে জমি বন্টন করা জাইয নয়। ১. অর্থাৎ এ অবস্থায়ও যেহেতু বাদী বিবাদী উভয় উপস্থিত, তাই

বিচারক তাদের দাবী অনুযায়ী জমি বা।
বাড়াটি বন্টন করে দেবেন।

কোন একজনের দাবী উত্থাপনের অবস্থায় তা বন্টন করে দেওয়া একটি অপরিহার্য হক বা (অধিকার, যা এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই)। যেমন আমরা পূর্বেও তা বর্ণনা করেছি।

আর যদি জমির অবস্থা এমন হয় যে, অংশীদারদের কোন একজন তো নিজ অংশ দ্বারা ফায়দা হাসিল করতে পারে, কিন্তু অপরজনের অংশ কম হওয়ায় সে তার অংশ দ্বারা ফায়দা হাসিল করতে পারছে না, বরং তার ক্ষতি হচ্ছে, এ অবস্থায় বেশী অংশের মালিক যদি বন্টনের দাবী করে, তবে বিচারক জমিটি বন্টন করে দেবেন। আর যদি কম অংশের মালিক এর দাবী করে, তাহলে বিচারক তা বন্টন করে দেবেন না। কেননা প্রথম ব্যক্তি তার জমি দ্বারা লাভবান হচ্ছে, কাজেই তার কথা ধর্তব্য হবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি বন্টনের দাবী উত্থাপন করে নিজের ধ্বংস কামনা করছে। কাজেই তার দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু ইমাম জাসসাস (র) এর বিপরীত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তার যুক্তি হলো এই যে, বেশী অংশের মালিক বন্টনের দাবী করে দ্বিতীয় পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ইচ্ছা করছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে নিজের ক্ষতিকে মেনে নিচ্ছে। । হাকিম শহীদ (র) তপ্রণীত মুখতাসার' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, শরীকদের যে কেউ বন্টনের দাবী উত্থাপন করলে বিচারক জমিটি বন্টন করে দেবেন। পূর্বোল্লেখিত আলোচনায় এর কারণ সন্নিবেশিত হয়েছে। পক্ষান্তরে কিতাবে যে মতটি উল্লেখ করা হয়েছে, তাই বিশুদ্ধতম । আর তা হলো প্রথমোক্ত অভিমতটি। | আর যদি অংশীদারদের প্রত্যেকের অংশই কম হয় এবং এ কারণে প্রত্যেক অংশীদার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে উভয় অংশীদারের সম্মতি ছাড়া বিচারক ঐ জমি বন্টন করবেন না। কেননা বন্টনের ব্যাপারে জোর প্রয়োগ করা হয় লাভালাভের পূর্ণতা বিধানের জন্য। অথচ এক্ষেত্রে (লাভ তো দূরের কথা) লাভ পূরাটাই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য উভয় অংশীদার যদি বন্টনের ব্যাপারে রাযী থাকে, তবে তা বন্টন করা জাইয হবে। কেননা, হক তো তাদেরই এবং তারাই তাদের নিজেদের অবস্থার ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। আর বিচারক তো বাহ্যিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে ফয়সালা দিয়ে থাকেন।

ইমাম কুদরী (র) বলেন ঃ আসবাব-সামগ্রী যদি একই ধরনের হয়, তবে (জোরপূর্বক হলেও) বিচারক তা বন্টন করে দেবেন। কেননা, এক জাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যও একই ধরণের হয়ে থাকে। কাজেই এ জাতীয় বস্তু বন্টন করা হলে তাতে সমতা বিধানও হবে এবং লাভালাভও পরিপূর্ণভাবে হাসিল হবে।

১. বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে যেহেতু এতে ক্ষতিই দেখা যাচ্ছে, কাজেই একজনের দাবীর উপর ফয়সালা করা হবে না। অবশ্য যদি উভয় ব্যক্তি সম্মত হয়ে বন্টনের দাবী করে, তবে ফয়সালা করা হবে। এ ক্ষেত্রে মনে করা হবে যে, হয়তো এতে কোন কল্যাণ নিহিত আছে।

৪২

আল-হিদায়া কিন্তু দুই প্রজাতির জিনিস যদি এমন হয় যে, এর কিছু অন্য প্রজাতির মধ্যে মিলানো থাকে, তাহলে বিচারক বল প্রয়োগ করে তা বন্টন করবেন না। কেননা দুই প্রজাতির বস্তুর মধ্যে সংমিশ্রন হয় না। কাজেই বন্টনের দ্বারা দুই বস্তুর পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয় না। বরং এতে হয় পরস্পরের মধ্যে বিনিময়। আর এ বিনিময় সিদ্ধ হওয়ার একমাত্র পথ হলো পরস্পর রাযী হয়ে তা করা, বিচারকের বল প্রয়োগে নয়।।

বিচারক (প্রয়োজনে বল প্রয়োগ করেও) বন্টন করে দিতে পারবেন ওয়নযোগ্য বস্তু এবং পরিমাণযোগ্য বস্তু, চাই তা বেশী থোক বা কম হোক। (এমনিভাবে) গণনাযোগ্য এমন বস্তুও, যা পরস্পর কাছাকাছি অর্থাৎ প্রায় সমান-সমান; এবং সোনা, রুপা, লোহা এবং তামার টুকরা। (এমনিভাবে বন্টন করে দিতে পারবেন) শুধু উট, গরু বা বকরী। কিন্তু বকরী, উট, ঘোড়া ও গাধা যদি একত্রিত থাকে, তাহলে বিচারক তা জোরপূর্বক বন্টন করবেন না। তবে বরতন এবং পাত্রও বন্টন করবেন না। কেননা এগুলোর তৈরী কৌশল বিভিন্ন রকমের হওয়ায় এগুলোকে বিভিন্ন প্রজাতির বস্তুর ন্যায় গণ্য করা হয়েছে। | হিরুভী কাপড় (অংশীদার কর্তৃক বন্টনের দাবী করার পর) বিচারক তা বন্টন করে দেবেন। কেননা এগুলো এক প্রকারের বিশেষ কাপড় হিসাবে গণ্য।

তবে কাপড়ের সংখ্যা যদি একটি মাত্র হয়, তাহলে বিচারক তা বন্টন করে দেবেন না। কেননা, একটি কাপড় যদি ভাগ করা হয়, তবে তাতে কেবল ক্ষতিই হয়। কারণ কাটা ছাড়া বন্টন করা আদৌ সম্ভব নয়। (অথচ কর্তন করার পর তা আর ব্যবহারযোগ্য থাকে না ।।

। অনুরুপভাবে যদি কাপড়ের সংখ্যা দুই হয় তবে তাও বিচারক বন্টন করবেন না; যদি এগুলোর মূল্য বিভিন্ন রকমের হয়। এর কারণ আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি। পক্ষান্তরে যদি কাপড়ের সংখ্যা তিনটি হয়, তবে এর হুকুম ভিন্নতর হবে। অর্থাৎ তা জাইয হবে। যদি একটি কাপড়কে দু'টি কাপড়ের পরিবর্তে অথবা এক কাপড় এবং অন্য কাপড়ের এক চতুর্থাংশকে; এক কাপড় ও অন্য কাপড়ের তিন চতুর্থাংশের পরিবর্তে প্রদান করা হয়। কেননা এ ক্ষেত্রে কোন কোন কাপড়ে বন্টন কার্য সম্পাদিত হচ্ছে, আবার কোনটির মধ্যে হচ্ছে না। আর এরূপ করা জাইয আছে।

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন ঃ গোলাম এবং হিরা-জহরতের মধ্যে যেহেতু মূল্যের কম-বেশী রয়েছে, তাই বিচারক (জোরপূর্বক) এসব কিছু বন্টন করবেন

। পক্ষান্তরে সাহেবায়ন (র) বলেন ঃ (বিচারক জোরপূর্বক) গোলাম বন্টন করে দিতে পারবেন। কারণ এসবের জাত এক। যেমন উট ও বকরীর মধ্যে বেশ-কম থাকা সত্ত্বেও তা বন্টন করা জাইয়। যেমনিভাবে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসাবে প্রাপ্ত গোলাম বন্টন করা জাই। (কাজেই সাধারণ গোলামও বন্টন করা যাবে।।

১. যেমন দুই ব্যক্তির মালিকানাধীন কিছু উট এবং গরু একত্রে মিলিতভাবে থাকে। ২. যেমন আমাদের দেশের পপলিন, টেট্রন, পলিষ্টার ইত্যাদি কাপড়।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর যুক্তি হলো ঃ মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণাগুণের মধ্যে বিরাট ব্যবধান বিদ্যমান। তাই মানুষের বিষয়টি বিভিন্ন প্রজাতির জীবের ন্যায় বলে গণ্য হবে। (অতএব বিভিন্ন প্রজাতির জীবের বন্টনের ক্ষেত্রে যেমন বিচারক বল প্রয়োগ করতে পারে না, এক্ষেত্রেও পারেবে না।) জীব-জানোয়ারের বিষয়টি মানুষ থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, এক জাতীয় জীবের ক্ষেত্রে সাধরণত: কম ব্যবধানই হয়ে থাকে। লক্ষ্নণীয় যে, আদম সন্তানের মধ্যেও নর ও নারী দুই জাতি হিসাবে গণ্য। অথচ জীব-জানোয়ারের মধ্যে নর ও মাদী (দুই জাতি নয়, বরং) একই জাতি হিসাবে গণ্য। এমনিভাবে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের গোলামের বিষয়টিও এ হুকুম থেকে ব্যতিক্রম। কেননা যোদ্ধাদের হক (গোলামের) মালিয়্যাতের (মূল্যের) সাথে সম্পর্কিত। এ কারণেই রাষ্ট্র প্রধান গোলাম বিক্রি করে এর মূল্য তাদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার অধিকার রাখেন। আর সাধারণ গোলামের ক্ষেত্রে অংশীদারদের হক গোলামের সত্বা এবং মালিয়্যাত উভয়ের সাথে সম্পর্কিত। কাজেই উভয় ধরনের গোলামের মধ্যে ব্যবধান সুস্পষ্ট।

হীরা-জহরতের বিষয়ে ফকীহগণ বলেন ? যদি এগুলো বিভিন্ন জাতের হয়-যেমন মমাতি, ইয়াকূত ইত্যাদি, তাহলে (বিচারক তা জোর করে বন্টন করবেন না, কেউ কেউ বলেন ঃ হীরা-মোতি যেগুলো বড় ধরনের, বিচারক তা বন্টন করবেন না। যেহেতু এগুলোর মধ্যে ব্যবধান বেশী। তবে ছোট ছোটগুলো বন্টন করে দেবেন। যেহেতু এগুলোর মধ্যে ব্যবধান কম। আবার কেউ বলেন ঃ হীরা-মোতি বন্টন করা আদৌ জাইয নয়। কেননা, হীরা ও মণি মুক্তা সম্বন্ধে যে অস্পষ্টতা রয়েছে, তা গোলামের বিষয়ের অস্পষ্টতা থেকেও অধিক। লক্ষ্নণীয় যে, কেউ যদি হীরা-মোতি ৰা ইয়াকূতের বিনিময়ে কোন মহিলাকে বিবাহ করে অথবা এসবের বিনিময়ে কারো সাথে খুলা করে, তাহলে এসবের নাম উল্লেখ করা সহীহ হবে না। কিন্তু গোলামের বিনিময়ে যদি বিবাহ বা খুলা করে, তবে তা সহীহ হবে। সুতরাং হীরা-মোতি বন্টনের ব্যাপারে বিচারক বল প্রয়োগ করতে পারবেন না।। ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ গোসলখানা, কুঁয়া এবং (আটা ইত্যাদি পেষার) চাক্কি (জোরপূর্বক) ভাগ করা যাবে না। অবশ্য অংশীদারগণ সম্মত হলে এগুলো ভাগ করা যাবে। অনুরূপভাবে দুই বাড়ীর মধ্যকার প্রাচীরও ভাগ করা যাবে না। কেননা, এতে উভয় পক্ষের ক্ষয়-ক্ষতি নিহিত রয়েছে। আর বন্টনের পর কারো অংশই এমন থাকবে না, যার দ্বারা কাংখিত উপকার হাসিল হবে। কাজেই এ জাতীয়) বিষয়াদি বিচারক জোরপূর্বক বন্টন করবেন না। অবশ্য তারা যদি পরস্পর রাযী থাকে, তবে তা জাইয হবে। এর কারণ আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ একই শহরে যদি যৌথ মালিকানাধীন কতগুলো বাড়ী থাকে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিচারক প্রতিটি বাড়ী পৃথক-পৃথকভাবে বন্টন করে দেবেন। সাহেবায়ন (র) বলেনঃ যদি অংশীদারদের ১. সুতরাং যৌথ মালিকানাধীন গোলামকে জীব-জানোয়ার এবং যুদ্ধ-লব্ধ গোলামের উপর কিয়াস করা যাবে

না। -১০

জন্য প্রত্যেক বাড়ীতে অংশ রেখে মিলিতভাবে বন্টন করা অধিক কল্যাণকর হয়, তাহলে বিচারক এভাবেই বন্টন করে দেবেন।১ ইমামগণের উপরোক্ত মতপার্থক্য যৌথ মালিকানাধীন পৃথক পানি ও বৃক্ষ শূন্য জমিখণ্ডসমূহেও বিদ্যমান।

সাহেবাইন (র)-এর যুক্তি হলো ঃ উপরোক্ত বাড়ীসমূহ বসবাসের প্রেক্ষিতে নাম এবং আকারের দিক থেকে একই জাতীয় জিনিষ। কিন্তু উদ্দেশ্য এবং বসবাসের বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে অর্থগত দিক থেকে বহু জাতীয় জিনিষ। কাজেই কোটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এ বিষয়টি বিচারকের মতামতের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। | আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর যুক্তি হলো : প্রতিটি বস্তুর গুণাগুণই মূলত: ধর্তব্য বিষয় এবং এটিই হলো মূল উদ্দেশ্য। আর এ উদ্দেশ্য দেশ, স্থান, প্রতিবেশী ইত্যাদির বিভিন্নতার কারণে খুব বেশী বিভিন্নতা হয়ে থাকে। এমনিভাবে মসজিদ ও পানির নিকটবর্তী হওয়ার প্রেক্ষিতেও এ উদ্দেশ্যের মধ্যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এ অবস্থায় বন্টনে সমতা বিধান করা সম্ভব নয়। এ কারণেই বাড়ী খরীদ করার জন্য উকীল নিয়োগ করা জাইয নয়। অনুরুপভাবে কেউ যদি কোন বাড়ীর বিনিময়ে বিবাহ করে, তাহলে এরূপ নাম উল্লেখ করা (মহর হিসাবে) সহীহ হবে না। এই ওকালত ও বিবাহ যদি কাপড়ের উপর হয়, তাহলে সেক্ষেত্রেও এই হুকুম হবে। কিন্তু একই বাড়ীতে যদি কয়েকটি ঘর থাকে,তবে এর হুকুম ভিন্নতর হবে। কেননা প্রতিটি ঘরকে ভিন্ন ভিন্নভাবে বন্টন করাতে বিরাট ক্ষতি রয়েছে। কাজেই বাড়ীটি যৌথভাবেই বন্টন করা হবে।

। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন ঃ ইমাম কুদূরী (র) একই শহরে' হওয়ার শর্ত আরোপ করে এ কথার প্রতি ইংগিত করেছেন যে, যদি বাড়ী দু'টি দুই শহরে থাকে, তাহলে সাহেবাইনের মতেও এগুলো যৌথভাবে বন্টন করা হবে না। (বরং পৃথক পৃথকভাবে বন্টন করা হবে।) হিলাল (র) সাহেবাইন থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, (না, বরং) যৌথভাবেই বন্টন করা হবে। বস্তুত একই মহল্লাতে বা কয়েক মহল্লতে যদি কয়েকটি ঘর থাকে, তাহলে এগুলোকে যৌথভাবে বন্টন করা হবে। কেননা এগুলোর মধ্যে ব্যবধান খুবই নগণ্য। যেসব মঞ্জিল একত্রে মিলিত, সেগুলো একত্রে মিলিত ঘরের মতই। আর যেসব মঞ্জিল পৃথক পৃথক আছে, সেগুলো পৃথক পৃথক বাড়ীর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা এর বিষয়টি বাড়ী ১. প্রতিটি বাড়া পৃথক পৃথকভাবে বন্টন করাকে ১৩ বলে। প্রত্যেক বাড়ীতে প্রত্যেকের অংশ রেখে

বন্ট কে ", বলে। কাজেই একই শহরে যদি যৌথ মালিকানাধীন কতগুলো বাড়ী থাকে, তাহলে এ বাড়া কিভাবে বন্টন করা হবে ? এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা ও সাহেবায়ন (র) এর মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন : প্রতিটি বাড়ী পৃথক পৃথকভাবে বন্টন করা হবে। সাহেবান (র) বলেন, এটি বিচারকের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। তিনি ভাল মনে করলে পৃথক পৃথকভাবে

বন্টন করবেন। আর ভাল মনে করলে প্রতিটি বাড়ী যৌথভাবেও বন্টন করতে পারবেন। ২. অর্থাৎ একজনকে কয়েকটি ঘর এবং অপরজনকেও অনুরূপ কয়েকটি ঘর দিয়ে দেওয়া হবে। ৩. মঞ্জিল হল বাড়ী (15) থেকে ছোট এবং ঘর (3) থেকে বড়। মৌলিকভাবে মঞ্জিলের সম্পর্ক বাড়ী-ঘর

উয়ের সাথেই রয়েছে। কাজেই কোন কোন ক্ষেত্রে এর হুকুম বাড়ীর মত হবে। আবার কোন কোন

ক্ষেত্রে এর হুকুম ঘরের মত হবে।

এবং ঘরের মাঝামাঝিতে রয়েছে। এ পূর্বে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মঞ্জিলের সম্পর্ক বাড়ী এবং ঘর উভয়ের সাথেই

রয়েছে। অবস্থার প্রেক্ষিতে ফয়সালা করা হবে। । ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ যদি সম্পত্তির মধ্যে বাড়ী ও জমি থাকে অথবা যদি বাড়ী ও দোকান থাকে, তাহলে বিচারক এগুলোর প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে ভাগ করে দেবেন। যেহেতু এগুলোর () বা জাত বিভিন্ন ।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন ঃ কুদূরী গ্রন্থপ্রণেতা বাড়ী ও দোকানকে' দুই জাতীয় বস্তু বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম খাসসাফ (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র) মাবসূতের ইজারা অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, দোকানের বিনিময়ে বাড়ার লাভালাভকে ইজারা দেওয়া জাইয নেই। এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, বাড়ী এবং দোকান একই জাতীয় জিনিষ। কাজেই একথা ধরে নিতে হবে যে, মাসআলাতে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। অথবা (এ কথা বলা হবে যে, এখানে) সূদ হারাম হওয়ার বিষয়টি সমজাতীয় হওয়ার সন্দেহের উপর নির্ভরশীল।

পরিচ্ছেদ : বন্টন পদ্ধতি সম্পর্কিত মাসাইল

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ বন্টনকারী ব্যক্তির জন্য সমীচীন হলো, যে সম্পত্তি বা বস্তুটি বন্টন করা হবে, প্রথমে সে কাগজের মধ্যে এর একটি নকশা তৈরী করবে। যাতে এ সম্পদের বন্টন কার্যের বিষয়টি সদা তার স্মরণে থাকে। তারপর কাগজের মধ্যেই তা সমান হারে ভাগ করবে। অর্থাৎ সে তা সমান হারে ভাগ করবে। কোন কোন বর্ণনায় 'it;' শব্দটিও উল্লেখ রয়েছে। এ হিসাবে এর অনুবাদ হবে, "এবং একে তিনি এ বন্টনের মাধ্যমে অপরাপর অংশ থেকে পৃথক করে দেবেন" এবং তা পরিমাপ করবেন। যাতে এখানে কি পরিমাণ জায়গা আছে, তা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। তারপর এতে যে ঘর-বাড়ী আছে, সেগুলোর মূল্যও সাব্যস্ত করবেন। কেননা, পরে এরও প্রয়োজন হবে। এরপর রাস্তা এবং পানির নালাসহ এক এক অংশকে অপরাপর অংশ থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে ভাগ করবেন। যাতে এক অংশের সাথে অপর অংশের কোন সম্পর্ক না থাকে। তাহলেই তাদের পরস্পরের ঝগড়া-বিবাদ শেষ হয়ে যাবে এবং বন্টনের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে সাধিত হবে।

তারপর একটি ভাগকে প্রথম অংশ, এর সাথের ভাগকে দ্বিতীয় অংশ, এর সাথের ভাগকে তৃতীয় অংশ বলে -এভাবে সবগুলো অংশের নামকরণ করবে। এরপর লটারী দেওয়া হবে। এতে যার নাম প্রথমে আসবে, সে প্রথম অংশ পাবে। যার নাম দ্বিতীয় বারে আসবে, সে দ্বিতীয় অংশ পাবে। (এভাবে শেষ পর্যন্ত চলতে থাকবে।) ১. উক্ত আলোচনার দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এখানে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে ঃ(১) বাড়ী ও দোকান এক জাতীয় জিনিস, (২) এগুলো দুই রকমের জিনিস; কিন্তু এতে এক জাতীয় হওয়ার সন্দেহ রয়েছে । আর সুদের ব্যাপারে সন্দেহ থাকাও হাকীকতের মতই। আর এ কারণেই উপোত ইয়াকে না-জাই বলা হয়েছে।

আল-জিরা

বস্তুত: এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো এই যে, অংশীদারদের ভাগসমূহের মধ্যে যে ভাগটি সবচেয়ে কম, সেটির প্রতি লক্ষ্য রেখেই সম্পত্তিকে বিভক্ত করা হবে। যদি সর্বাধিক কম অংশটি এক তৃতীয়াংশ হয়, তাহলে জমিটিকে তিন ভাগে ভাগ করা হবে। আর যদি ষ**ষ্ঠাংশ** হয়, তবে জমিটিকে ছয় ভাগে ভাগ করা হবে, যাতে বন্টন করা সম্ভব (ও সহজ) হয়। আল্লাহ প্রদত্ত তাওফীকের ভিত্তিতে 'কিফায়তুল মুনতাহী' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আমি সবিস্তার আলোচনা করেছি।

গ্রন্থকার কিতাবে "এবং বন্টনকারী ব্যক্তি রাস্তা ও পানির নালাসহ প্রতিটি ভাগকে আলাদা ও পৃথক করে দেবেন বলে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, এতে তিনি উত্তম বিষয়টির বর্ণনা দিয়েছেন। (এটি কোন অপরিহার্য বিষয় নয়। কাজেই বন্টনকার যদি তা না করেন, বা তার পক্ষে যদি তা সম্ভব না হয়, তবুও বন্টন জাইয হবে। ইনশাআল্লাহ্ এ সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত আলোচনা করবো।

। আর লটারী দেওয়ার কথা যে উল্লেখ করা হয়েছে- এর উদ্দেশ্য হলো : অংশীদারদের চিত্তের প্রশান্তি বিধান করা এবং স্বজনপ্রীতির অপবাদ থেকে রক্ষা পাওয়া। কাজেই বন্টনকারী যদি লটারী ছাড়াই তাদের প্রত্যেকের অংশ বির্ধারণ করে দেন, তবে অও জাইয হবে। কেননা, বন্টনের বিষয়টিও অর্থগত দিক থেকে আদালতের ফয়সালার অনুরূপ। সুতরাং (বিচারকের ন্যায়) তিনিও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার অধিকারী হবেন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : বন্টনকারী ব্যক্তি দিরহাম ও দীনারকে বন্টনের মধ্যে শামিল করবে না। কিন্তু অংশীদারগণ যদি এ বিষয়ে বাদী থাকে, তাহলে তিনি তা করতে পারবেন। কেননা দিরহামের মধ্যে অংশীদারীত্ব চলে না। অথচ বন্টনের বিষয়টি অংশীদারীত্বেরই একটি হক তা অধিকার । অধিকন্তু অংশীদারগণ যদি এ বিষয়ে রাযী থাকে, তাহলে তিনি তা করতে পারবেন। কেননা (এরূপ করার অবস্থায় একজন তো মূল জমিতে পৌছে যাবে, অথচ তার যিম্মায় থেকে যাবে অন্য জনের দিরহাম সমূহ। এ ক্ষেত্রে এ কাখারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে হয়তো এ দিরহাম সমূহ তার নিকট হস্তান্তর করবে না। । যদি (সম্পত্তিতে) জমি এবং ইমারত থাকে, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে এ দুয়ের প্রত্যেকটি মূল্য হিসাবে বন্টন করা হবে। কেননা মূল্য সাব্যস্ত করা ব্যতিরেকে এ ক্ষেত্রে সমতা বিধান করা সম্ভব নয়। ১. যেমন দুই ব্যক্তি যৌথভাবে একটি বাড়ীর মালিক। তাদের একজন চাচ্ছে বাড়ীর যে অংশে বিল্ডিং আছে,

সে ঐ অংশ নেবে এবং অতিরিক্ত অংশের জন্য অপর অংশীদারকে টাকা দিয়ে দেবে। কিন্তু অপর অংশীদার টাকা নিতে বই নয়; বরং সে এর বিনিময়ে জমি নিতে চাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বিচারক তাকে টাকা নিতে বাধ্য ক, পারবে : রং তাকে নিই দিতে হবে ।

ইমাম আবু হানীফা (র) হতে বর্ণিত আছে যে, জমি পরিমাপ করে বন্টন করা হবে। কেননা, পরিমাপযোগ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে এটিই হচ্ছে মূল বিধান। এরপর ইমারত যার ভাগে পড়বে অথবা যার ভাগে উত্তম জমি পড়বে, সে অপরজনকে কিছু দিরহাম (টাকা) দিয়ে দেবে, যাতে উভয়ের অংশ সমান সমান হয়ে যায়। (তার মতে) জরুরতের প্রেক্ষিতে দিরহাম বন্টনের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন, বোনের মালে (হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে) ভাইয়ের কোন কর্তৃত্ব নেই। কিন্তু বিবাহের জরুরতের প্রেক্ষিতে সে বোনের মহর নির্ধারিত করে দেওয়ার অধিকার রাখে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, যার ভাগে ইমারত পড়বে, সে এ ইমারতের বিনিময়ে অপর শরীককে এর সমপরিমাণ আঙ্গিনা দিয়ে দেবে। এরপরও কারো ভাগে যদি কিছু অতিরিক্ত থেকে যায় এবং সমতা বিধান সম্ভব না হয়, যেমন আঙ্গিনা ইমারতের মূল্যের সমপরিমাণ হয়না, তহলে সে(ইমারত ওয়ালা ব্যক্তি) অপর অংশীদারকে অতিরিক্ত পরিমাণের জন্য কিছু দিরহাম (টাকা) পরিশোধ করে দেবে। কেননা, জরুরত শুধু এই পরিমাণটুকুর ক্ষেত্রেই। কাজেই এই টুকুর ক্ষেত্রেই কেবল মূল বিধানকে বর্জন করা যাবে। (এর বেশীর ক্ষেত্রে করা যাবে না।) এই অভিমতটি মাবসূত গ্রন্থের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : বিচারক যদি অংশীদারদের অংশসমূহ বন্টন করে দেন, অথচ তাদের কোন একজনের পানির নালা বা রাস্তা রয়েছে অপরজনের অংশের মধ্যে এবং বন্টনের মধ্যে (সময়) এগুলোর ব্যাপারে কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি, এ অবস্থায় যদি অপরের অংশ থেকে তার রাস্তা ও নালাকে ফিরিয়ে

• দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে অপরের অংশে রাস্তা বানানো এবং পানি বহিয়ে নেওয়া তার জন্য জাইয হবে না। কেননা, অন্যের ক্ষতি সাধন কারা ব্যতিরেকে এ ক্ষেত্রে বন্টনের মর্মার্থের পূর্ণ বাস্তাবায়ন সম্ভব। আর যদি ঐ ভাবে তা সম্ভব না হয়, তবে (কৃত) বন্টন রহিত হয়ে যাবে। কেননা, অন্যের অংশের সাথে সংশ্লিষ্টতা বাকী থাকার কারণে বন্টনের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে। কাজেই পুনরায় নতুনভাবে বন্টন করতে হবে। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, ক্রয়- বিক্রয় এ অবস্থায় ফাসিদ হয় না। বস্তুত: ক্রয়- বিক্রয়ের উদ্দেশ্য হলো, কোন বস্তুর মূলের মালিক হওয়া। আর এটি হলে উপকৃত হওয়া অসম্ভব এমন বিষয়ের সাথেও জমা (একত্রিত) হতে পারে। পক্ষান্তরে বন্টনের বিষয়টি এমন নয়। কেননা, বন্টন তো প্রবর্তিত হয়েছে-লাভের পূর্ণতা বিধানের জন্য। আর লাভের পূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত হয়না রাস্তা ছাড়া। যদি প্রথমোক্ত অবস্থায় হকসমূহের কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তবে এ ক্ষেত্রেও পূর্ববৎ জবাব প্রযোজ্য হবে। কেননা, বন্টনের অর্থ হলো : পৃথক করণ ও ১. অর্থাৎ বিচারক অংশীদারদের অংশ বন্টন করে দেওয়ার সময় নালা এবং রাস্তা সম্পর্কে কোন আলোচনা

হলে না। পরে দেখা গেল, কোন এক শীকের। ২. অ যদি মা ও নানা অন্যের জমি থেকে সরিয়ে সনি ব্যক্তির অংশের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া সব হয়।

আলাদা করণ। এটি তখনই পূর্ণতায় পৌছবে যদি তাদের একজনের অংশের সাথে অপর জনের অংশের কোন সম্পর্ক অবশিষ্ট না থাকে। আর এমনটি করা সম্ভবও বটে।

আর তার অংশের রাস্তা ও নালার মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব, এতে কারো কোন ক্ষতিও হবে না। অতএব তা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য যে, ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম হবে, যদি এ ক্ষেত্রে হুকুম এর কথা উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ এ অবস্থায় তার রাস্তা ও নালা যতকিছু আছে সবই এর মধ্যে দাখিল বলে গণ্য হবে। কেননা, অন্যের মালিকানার সাথে এতটুকু সম্পর্ক বাকী থাকা অবস্থায়ও বিক্রয়ের অর্থ অর্থাৎ মালিক বানিয়ে দেওয়ার বিষয়টি এতে পাওয়া যাওয়া সম্ভব।

আর শেষোক্ত অবস্থায় নালা ও রাস্তা বন্টনের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। কেননা, বন্টন তো করা হয় পূর্ণাঙ্গ রূপে ফায়দা হাসিল করার জন্য। আর পূর্ণাঙ্গভাবে ফায়দা হাসিল হয় রাস্তার ও নালার দ্বারা। যখন রাস্তা ও নালার কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হবে, তখন ফায়দা পূর্ণ করার জন্য এ গুলোও বন্টনের মধ্যে দাখিল হবে। আর বন্টনের মধ্যে পৃথক করণের অর্থ রয়েছে এবং পৃথক করণ সাব্যস্ত হবে সম্পর্ক ছিন্ন করা দ্বারা -যেমন, আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এই পৃথক করণের প্রতি লক্ষ্য করে একথা বলা যায় যে, রাস্তা এবং নালা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ছাড়া বন্টনের মধ্যে দাখিল হবে না। কিন্তু ইজারার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, সেখানে এগুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ছাড়াও চুক্তির মধ্যে দাখিল থাকে। কেননা, ইজারার উদ্দেশ্য হলো উপকার হাসিল করা। আর তা রাস্তা-নালাকে অন্তর্ভুক্ত করণ ব্যতীত হাসিল হয় না। কাজেই ইজারার মধ্যে উল্লেখ করা ছাড়াও রাস্তা ও নালা চুক্তির মধ্যে শামিল হবে।

যদি অংশীদারগণের মধ্যে বন্টনে রাস্তা ছাড়ার ব্যাপারে পরস্পর মতানৈক্য হয় আর এ অবস্থায় যদি তাদের নিজ নিজ অংশে রাস্তা খোলা সম্ভব হয় তাহলে বিচারক তাদের সকলের জন্য রাস্তা খোলা ছাড়াই তাদের সম্পত্তি বন্টন করে দেবেন। কেননা, রাস্তা রাখা ব্যতিরেকেই পৃথককরণের অর্থ এ ক্ষেত্রে পাওয়া যায়।১

আর যদি এমনটি সম্ভব না হয় অর্থাৎ প্রত্যেকের অংশে ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা করা সম্ভব না হয়, তাহলে বিচারক সমস্তের জন্য একটি রাস্তা রেখে বন্টনকার্য সম্পাদন করবেন, যাতে রাস্তা ব্যতীত সম্পত্তির অবশিষ্টাংশের ফায়দা পরিপূর্ণভাবে হাসিল করা সম্ভব হয়।

১ অর্থাৎ যদি অংশীদারদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়, কেউ বলে, রাস্তা রাখা হবে না, আবার কেউ বলে যে, রাস্তা রাখা তো হবে। এরূপ অবস্থা হলে বিচারক অনুসন্ধান করে দেখবেন যে, তাদের পক্ষে নিজ নিজ অংশে রাস্তা বানানো সব কিনা? যদি সম্ভব হয়, তবে রাস্তা বের করা ছাড়াই বিচারক তাদের সম্পত্তি বন্টন করে দেবেন। এতে কারো কোন ক্ষতি হবে না।

যদি সম্পত্তির অংশীদারগণ রাস্তার পরিমাণ নিয়ে মতভেদ করে, তাহলে বাড়ীর প্রধান ফটকের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ যে পরিমাণ হবে, ঐ পরিমাণ রাস্তা রাখা হবে। কেননা, এর দ্বারাই প্রয়োজন সেরে যায় এবং তারা তাদের অংশের আনুপাতিক হারে রাস্তার মালিকানা লাভ করবে, যেমন বন্টনের আগে ছিল। কেননা, বন্টন তো হয়েছে রাস্তা ব্যতীত অন্যান্য অংশে, রাস্তা সহকারে নয়। যদি বন্টনের সময় তারা এরূপ শর্ত করে যে, রাস্তা তাদের মধ্যে ও করে থাকবে (অর্থাৎ কারো ভাগে থাকবে দুই তৃতীয়াংশ এবং অপর জনের ভাগে থাকবে এক তৃতীয়াংশ) তাহলে তা জাইয হবে। যদিও মূল রাস্তাটি তাদের মধ্যে আধাআধি করে আছে। কেননা, পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে কম- বেশী করে বন্টন করা জাইয।।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : যদি নীচের তলায় দুই ব্যক্তির অংশীদারীত্ব থাকে, এর উপরে অংশীদারীত্ব না থাকে, অথবা উপরের তলায় অংশীদারীত্ব থাকে, কিন্তু নীচে নয়, অথবা নীচ ও উপর উভয় তলায় অংশীদারীত্ব থাকে তবে প্রত্যেক তলার মূল্য পৃথক পৃথক ভাবে সাব্যস্ত হবে। এ ক্ষেত্রে এ (মূল্য) ছাড়া অন্য কিছু ধর্তব্য হবে না।

গ্রন্থকার বলেন : এটি ইমাম মুহাম্মদ (র) এর অভিমত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন : এ জাতীয় সম্পত্তি পরিমাপ করে বন্টন করা হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) এর যুক্তি হচ্ছে : নীচের তলায় এমন উপযুক্ততা এবং সম্ভাবনা রয়েছে, যা উপরের তলায় নেই। যেমন, (নীচে) পানির কূপ তৈরী করা, মাটির নীচে কামরা তৈরী করা, উট বা ঘোড়ার খোয়াড় বানানো, ইত্যাদি। এ অবস্থায় উপর ও নীচ তলার মধ্যে মূল্য নির্ধারণ করা ব্যতিরেকে সমতা বিধান করা সম্ভব নয়। (কাজেই মূল্য) সাব্যস্ত করে সে হিসাবেই তা বন্টন করা হবে।) আর ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর যুক্তি হলো : হাত ও গজ দ্বারা পরিমাপ করে বন্টন করাই হলো আসল। কেননা, এখানে অংশীদারীত্ব তো পরিমাপযোগ্য বস্তুতেই, মূল্যের ক্ষেত্রে নয়। কাজেই যথা সম্ভব পরিমাপ করে বন্টন করার উপরই আমল করার চেষ্টা করা হবে। আর এখানে লক্ষ্যণীয় হলো বসবাসের ক্ষেত্রে সমতা বিধান করা, উপকার হাসিল করার ক্ষেত্রে সমতা বিধান করা নয়।

এরপর ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মধ্যেও এ ব্যাপারে মতভেদ হয় যে, গজ বা হাত দ্বারা কেমন করে পরিমাপ করা হবে? ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন : নীচের তলার এক হাত উপরের তলার দুই হাতের সমান। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন : (না, বরং) এক হাতই এক হাতের সমান বলে গণ্য হবে। কেউ কেউ বলেন, নীচের তলাকে উপর তলার উপর অগ্রাধিকার প্রদান বা উভয়টিকে সমান মান দেওয়া অথবা কখনো নীচের তলাকে অগ্রাধিকার দেওয়া আবার ১. এখানে দৈর্ঘ্য বলতে উচ্চতা বুঝানোই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ রাস্তার উচ্চতা নিয়ে যদি মতভেদ হয়, তাহলে বাড়ীর

প্রধান ফটকের উচ্চতা যে পরিমাণ এবং এর প্রস্থ যে পরিমাণ, সে হিসাবেই রাস্তার উচ্চতা এবং প্রস্থের বিষয়টি নির্ণয় করা হবে।

কখনো উপরের তলাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে আমাদের ইমামত্রয় যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা তারা তাদের সমকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে করেছেন অথবা নিজ নিজ শহরের লোকদের রেওয়াজ হিসাবে বলেছেন। কেউ কেউ বলেন : (না,) ফিকহী কারণেই এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন; রেওয়াজ হিসাবে নয়।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর বক্তব্যের যুক্তি হচ্ছে : উপরের তলার তুলনায় নীচের তলায় দ্বিগুণ ফায়দা নিহিত আছে। কেননা, উপরের তলা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও নীচের তলার ফায়দা বাকী থেকে যায় । কিন্তু নীচের তলা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর উপরের তলার ফায়দা আর বাকী থাকে না। অধিকন্তু নীচের তলায় ভিন্নভাবে কিছু বানানো এবং বসবাস করা উভয়টিই সম্ভব। কিন্তু উপরের তলায় শুধু মাত্র বসবাস করাই সম্ভব, অন্য কিছু সম্ভব নয়। কেননা, নীচের তলার মালিকের সম্মতি ব্যতিরেকে উপরের তলায় কোন কিছু বানানো সম্ভব নয়। কাজেই নীচের তলার এক হাত উপরের তলার দুই হাতের সমান বলে ধর্তব্য হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর যুক্তি হলো : উপর তলা এবং নীচের তলা উভয় তলার উদ্দেশ্যই হলো- বসবাস করা। আর এ বসবাসের ক্ষেত্রে উভয় তলা হচ্ছে সমান

(উভয়ের ফায়দাই হলো বরাবর। কেননা, ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মূলনীতি অনুসারে প্রত্যেক তলার মানুষের জন্যই এমন কিছু সম্ভব; যা অন্যের জন্য ক্ষতিকর নয়। (কাজেই উপর তলার এক হাত নীচের তলার এক হাতের সমান বলেই গণ্য হবে।) | আর ইমাম মুহাম্মদ (র) এর যুক্তি হলো : উপর তলা এবং নীচের তলার গরম ও ঠান্ডা এক রকমের হয় না। এই হিসাবে উভয় তলার ফায়দাও বিভিন্ন রকমের। এ অবস্থায় মূল্যের ভিত্তিতে উপর তলা ও নীচের তলার মধ্যে সমতা বিধান করা ব্যতিরেকে অন্য উপায়ে সমতা বিধান করা সম্ভব নয়। (কাজেই মূল্যের ভিত্তিতেই উভয় তলার মধ্যে সমতা বিধান করা হবে। বর্তমানে ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতামতের উপরই ফাতওয়া। অধিকন্তু তার মতের যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য অতিরিক্ত ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর বক্তব্যের ব্যাখ্যা যা কিতাবে (কুদূরীতে) উল্লেখ রয়েছে, তা হলো : sk s; তথা দ্বিতল ভবনের ৩৩ হাত শুধু উপর তলা ভবনের ১০০ হাতের সমান হবে। কেননা, শুধু উপর তলা- নীচ তলার অর্ধেকের অনুরূপ। সুতরাং নীচ তলার ৩৩ হাত উপর তলার ৬৬৪ হাত এর সমান হবে। এর সাথে আরো যোগ হবে উপর তলার ৩৩ হাত । এই হিসাবে ১০০ হাত - যা শুধু উপর তলা ভবনের ১০০ হাতের সমান। আর শুধু নীচ তলা বিশিষ্ট ভবনের ১০০ হাত) (L& তথা দ্বিতল ভবনের ৬৬ হাতের সমান হবে। কেননা, এর (Ls) উপর তলা- নীচ তলার অর্ধেকের মত। এই হিসাবে এর সর্বশেষ পরিমাণ হলো ১০০ হাত। যেমন- আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

অধ্যায় ও বন্টনের মাসাইল

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর বক্তব্যের ব্যাখ্যা হলো : ak : তথা দ্বিতল ভবনের ৫০ হাত শুধু নীচ তলা ভবনের ১০০ হাতের সমান অথবা শুধু উপর তলা ভবনের ১০০ হাতের সমান হবে।

কেননা ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে উপর-নীচ উভয় সমান। কাজেই পূর্ণাঙ্গ (দ্বিতল ভবনের ৫০ হাত- ১০০ হাতের সমান বলে গণ্য হবে। ৫০ হাত নীচের তলা থেকে আর বাকী ৫০ হাত উপরের তলা থেকে ধর্তব্য হবে ।

। ইমাম কুদূরী (র) বলেন : বন্টনপ্রার্থী অংশীদারদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার পর যদি বন্টনকারী দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

গ্রন্থকার বলেন : উপরে কুদূরী গ্রন্থকার যা বলেছেন, তা মূলত: ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন : তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর প্রথম অভিমতও এরূপই ছিল। ইমাম শাফিঈ (র) ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য ফকীহ খাসসাফ (র) ইমাম মুহাম্মদ (র) এর অভিমত শায়খায়নের অভিমতের অনুরূপ বলে। উল্লেখ করেছেন। বিচারকের পক্ষ হতে নিয়োগ প্রাপ্ত দুই বন্টনকারী এবং অন্যান্যদের হুকুম একই।

ইমাম মুহাম্মদ (র) এর যুক্তি হলো : তারা (সাক্ষীদ্বয়) তাদের নিজেদের কর্মের অনুকূলে সাক্ষ্য দিয়েছে (অথচ নিজের ব্যাপারে নিজের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না।) কাজেই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। । যেমন কেউ যদি নিজের গোলাম আজাদ করার বিষয়টিকে অপরের কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট করে এবং এ অবস্থায় ঐ তৃতীয় ব্যক্তি যদি নিজের সে কর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে নিজেই সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহলে তার এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না ।

শায়খাইনের যুক্তি হলো : বন্টনকারীদ্বয় অন্যের কর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেছে। আর তা হলো : বন্টিত সম্পত্তি বুঝে পওয়া এবং দখলে নেওয়া। তারা তাদের নিজেদের কর্মের উপর সাক্ষী দেয়নি। কেননা, তাদের কাজ তো হলো বন্টন করে পরস্পরের হক আলাদা করে দেওয়া। এ কাজের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদানের কোন প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত: এ পৃথককরণের বিষয়টি ১০ , তথা এমন কোন বিষয় নয়, যার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া যায়। কেননা, এটি (পৃথক করণকে মেনে নেওয়া) কোন অপরিহার্য ব্যাপার নয়। এটি তো অপরিহার্য হয় দখল করা ও বুঝে নেওয়ার দ্বারা। আর এ দখল ও বুঝে নেওয়া হচ্ছে অপরের কাজ (বন্টনকারীদের কাজ নয়)। সুতরাং অন্যের কাজের ব্যাপারে বন্টনকারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

ইমাম তাহাভী (র) বলেন, বন্টকারীদ্বয় যদি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বণ্টনকার্য করে থাকেন, তাহলে ফকীহগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মতে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে

।কোন কোন মাশাইখ এ অভিমতের প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছেন বলে উল্লেখ পাওয়া -~-১১

আল-হিদায়া

যায়। কেননা, তারা (সাক্ষীদ্বয়) এমন কাজ পরিপূর্ণ হয়েছে বলে দাবী করছে, যে কাজের ব্যাপারে তাদেরকে শ্রম বিনিয়োগের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কাজেই এটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে শাহাদাত (সাক্ষ্য) বলে ধর্তব্য হলেও সূক্ষ্ণ ও অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিতে এটি হলো একটি দাবী । অতএব এ অবস্থায় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে এ মাসআলার ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো : বন্টনকারীদ্বয়ের এ সাক্ষ্য তাদের নিজেদের অনুকূলে কোন লাভালাভকে টেনে আনছে না। কেননা, বন্টনপ্রার্থী অংশীদার ব্যক্তিগণ এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ একমত যে, বন্টনকারীদ্বয়কে যে কাজ, তথা সম্পত্তি পৃথক করণ ও ভাগ করণের কাজে শ্রম বিনিয়োগের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে, তারা তা পূরা করেছে। (অতএব বুঝা যাচ্ছে যে, তাদের কর্মের ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই), মতভেদ হলো : হক বুঝে পাওয়ার ব্যাপারে। কাজেই তাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করার কোন সুযোগ নেই। (এই হিসাবে বন্টনকারীদ্বয়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়)। | যদি একজন বন্টনকারী সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তা গ্রহণীয় হবে না। কেননা, একা-এক ব্যক্তির সাক্ষ্য অপরের বেলায় গ্রহণযোগ্য হয়না। বিচারক যদি নিজের কোন ব্যক্তিকে বলেন, অপর কোন ব্যক্তির নিকট মালামাল হস্তান্তর করে দেওয়ার জন্য, তাহলে আমীনের কথ্য গ্রহণযোগ্য হবে- তার উপর থেকে জরিমানা করার ক্ষেত্রে। কিন্তু অন্যের উপর কোন কিছুকে চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে

। যদি সেই তৃতীয় ব্যক্তি এ বিষয়টিকে অস্বীকার করে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

অনুচ্ছেদ

বণ্টনে ভুল হয়েছে বলা এবং এতে মালিকানার দাবী উত্থাপন করা

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ; যদি বন্টনপ্রার্থীদের কোন একজন বন্টনে ভুল হয়েছে দাবী করে বলে যে, তার ভাগের কিছু জিনিস তার (অমুক) সাথীর দখলে রয়েগিয়েছে, অথচ সে তার অংশ বুঝে পাওয়ার বাপারে প্রথমে স্বীকারোক্তিও করেছিল, তাহলে দলীল প্রমাণ ছাড়া তার এ কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। কেননা বন্টন কার্য সম্পাদিত হওয়ার পর, সে তা রহিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে দাবী করছে। কাজেই দলীল- প্রমাণ ছাড়া তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

যদি বাদী ব্যক্তির অনুকূলে দলীল-প্রমাণ সাব্যস্ত না হয় তাহলে **অং**শীদারদের থেকে শপথ নেওয়া হবে (যদি বাদী চায়)। তাদের থেকে যদি কেউ শপথ করতে অস্বীকার করে, তবে তার এবং বাদীর অংশ একত্রিত করা হবে। পরে তাদের হিস্যা অনুপাতে এ সম্পত্তি তাদের মধ্যে বন্টন করা হবে।

। কেননা, অস্বীকার করা বিশেষ ভাবে তার ক্ষেত্রে দলীল হিসাবে কাজ করবে। অতএব তাদের ধারণা অনুপাতে তাদের সাথে আচরণ করা হবে। (গ্রন্থকার বলেন : তার দাবী গ্রহণ না করাই উচিত। কেননা, তার বক্তব্যে বৈপরিত্য বিদ্যমান রয়েছে। গ্রন্থকার পরবর্তী বাক্যে এদিকেই ইংগিত করেছেন।

বাদী যদি বলে : আমি আমার হক বুঝে পেয়েছি, তবে তুমি আমার থেকে কিছু সম্পত্তি নিয়ে গিয়েছে,তাহলে শপথসহ বিবাদীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, বাদী- বিবাদীর বিরুদ্ধে সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার দাবী করছে। অথচ সে এ বিষয়টিকে অস্বীকার করছে।

যদি বাদী বলে, আমার জায়গা ঐ পর্যন্ত, কিন্তু সে আমাকে তা হস্তান্তর করে দেয়নি, আর যদি সে সম্পত্তি বুঝে পাওয়ার ব্যাপারে স্বীকারোক্তিও ব্যক্ত না করে, এ অবস্থায় তার সাথে যে ব্যক্তি শরীক, সে যদি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাহলে তারা উভয়েই শপথ করবে, এরপর এ বন্টন বাতিল করে দেওয়া হবে। কেননা, বন্টনের মাধ্যমে তারা যে পরিমাণ সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছে, ঐ পরিমাণ নিয়েই তাদের মধ্যে মতভেদ। কাজেই এটি নজীর ঐ মতভেদের, যা বিক্রীত মালের ১. বণ্টনকারী ব্যক্তি সম্পত্তি বন্টন করে দেওয়ার পর যদি এতে কোন ভুল ধরা পড়ে, অথবা কেউ যদি বন্টিত সম্পত্তিতে মালিকানা দাবী করে, তবে এর বিভিন্ন ধরন ও প্রক্রিয়া হতে পারে। **এগুলোর প্রত্যেকটির হুকুম** ভিন্ন । এ পরিচ্ছেদে এরই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আল-হিদায়া

{s, ৭।ণের ব্যাপারে সংঘটিত হয়ে থাকে। পূর্বে পরস্পর শপথ করার বিধিবিধান সম্পর্কিত আলোচনায় এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। । যদি অংশীদার দু'জন সম্পদের মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে মতভেদ করে, তাহলে তাদের বক্তব্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হবে না। কেননা এটি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ। এ অভিযোগ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধর্তব্য হয় না। অনুরূপভাবে বন্টনের মধ্যেও তা শোনা হবে না। কেননা, এখানে বন্টনপ্রার্থীদের মধ্যে পরস্পর সম্মতি রয়েছে। কিন্তু বণ্টন যদি বিচারকের ফয়সালা অনুপাতে হয় এবং পক্ষপাতিত্ব যদি খুব বেশী হয় (তাহলে অভিযোগ শোনা হবে। কেননা, বিচারকের হস্তক্ষেপে ন্যায়পরায়ণতা বিদ্যমান থাকা শর্ত, {অথচ এখানে তা নেই ।) যদি দুই শরীকের মধ্যে কোন বাড়ী বন্টন হয় এবং এ বন্টনে তারা এক একটি অংশ প্রাপ্ত হয়, এ অবস্থায় তাদের একজন যদি অন্যের দখলে বিদ্যমান কোন একটি ঘরের ব্যাপারে এ মর্মে দাবী করে যে, বন্টনে একটি সে প্রাপ্ত হয়েছিল (কিন্তু সে তা-তার নিকট হস্তান্তর করেনি) এ পর্যায়ে বিবাদী যদি বাদীর দাবী অস্বীকার করে, তাহলে বাদীর উপর অপরিহার্য হবে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা। এর কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আর যদি তারা উভয়েই সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে , তবে বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা, বাদীর এখানে দখলদারীত্ব নেই। আর যার দখলদারীত্ব নেই, তার সাক্ষ্য প্রমাণই অগ্রাধিকার পায় দখলদার ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রমাণের

উপর। যদি সম্পত্তি বুঝে পাওয়ার স্বীকারোক্তির আগে আগে ঘটনা ঘটে, তাহলে তারা উভয়ে শথপ করবে এবং বন্টনকে রদ করে দেবে। অনুরূপ ভাবে যদি তারা সীমানা নিয়ে মতভেদ করে এবং উভয়ই সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তাহলে ফয়সালা দেওয়া হবে প্রত্যেকের জন্য ঐ অংশের, যা অপরের দখলে আছে। এর কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যদি একজনের অনুকূলে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে তার পক্ষ্যে ফয়সালা দেওয়া হবে। আর যদি কারো পক্ষেই সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়া যায়, তবে তারা উভয় শপথ করবে, যেমন : বেচা-কেনার মধ্যে হয়ে থাকে।

পরিচ্ছেদ : হক তথা মালিকানা দাবী করার মাসাইল ইমাম কুদূরী (র) বলেন : (বন্টনের পর) যদি দুই শরীকের কোন এক জনের অংশের নির্দিষ্ট কিয়দংশের ব্যাপারে মালিক বের হয়ে আসে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে এতে বন্টন বাতিল হবে না। এ অবস্থায় উক্ত ব্যক্তি তার অংশের সমপরিমাণ তার সাথীর অংশ থেকে নিয়ে নিবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন : এ অবস্থায় বন্টন রহিত বা বাতিল হয়ে যাবে।

। গ্রন্থকার বলেন : ইমাম কুদূরী (র) এর মতে, নির্দিষ্ট কিয়দংশের মধ্যে মালিক বের হয়ে এলে ইমামদ্বয়ের এ মতভেদ প্রযোজ্য হবে । আসরার' গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণিত

১. অর্থ

মন রে জংশটি যার দখলে আছে, তা দি ৩২ জন পাবে।

অধ্যায়ঃ বন্টনের মাসাইল

রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে সহীহ হলো : দুই শরীকের কোন এক জনের অবিভাজ্য কিয়দংশের মধ্যে মালিক বের হয়ে এলে ইমামদ্বয়ের এ মতভেদ প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি নির্দিষ্ট কিয়দংশের মধ্যে মালিক বের হয়ে আসে, তবে ফকীহগণের সর্বসম্মত রায় অনুসারে উক্ত বন্টন বাতিল হবে না। আর যদি পূর্ণ সম্পত্তির অবিভাজ্য । কিয়দংশের ব্যাপারে মালিক বের হয়ে আসে, তবে ফকীহগণের সর্বসম্মত রায়ে বন্টন বাতিল হয়ে যাবে। এ হিসাবে এখানে তিনটি অবস্থা হলো। ইমাম কুদূরী (র) এখানে ইমাম মুহাম্মদ (র) এর অভিমতটি উল্লেখ করেননি। অবশ্য আবু সুলায়মান (র) তাকে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর সাথে উল্লেখ করেছেন। আর আবু হাফস (র) তাকে ইমাম আর । (র) এর সাথে উল্লেখ করেছেন। এটিই বিশুদ্ধতম মত । ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর যুক্তি হলো : অবিভাজ্য কিয়দংশের মালিক বের হয়ে আসায় একথা প্রকাশ পেয়ে গেছে যে, উক্ত দুই মালিকের মালে তৃতীয় অপর একজন মালিকও আছে। কাজেই তার সম্মতি ছাড়া বন্টন বাতিল বলে পরিগণিত হবে। যেমনিভাবে বন্টন বাতিল বলে পরিগণিত হয়, যখন উভয়ের অবিভাজ্য অংশে মালিক বের হয়ে আসে। এর কারণ হলো : অবিভাজ্য অংশের মালিক বের হয়ে আসার কারণে বন্টনের অর্থ শেষ হয়ে গিয়েছে। আর তা হলো : পৃথক পৃথক করণ। কেননা, এ অবিভাজ্য অংশের মালিকানা ওয়াজিব করে অবিভাজ্য ভাবে অপরের অংশ থেকে অনুরূপ পরিমাণ সম্পত্তি নিয়ে নেওয়া, নির্দিষ্ট কিয়দংশের মালিক বের হয়ে আসার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম।

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর যুক্তি হলো : কোন এক শরীকের অংশের অবিভাজ্য কিয়দংশের মালিক বের হয়ে আসার কারণে পৃথক করণের অর্থ শেষ হয় না। আর এ কারণে শুরু অবস্থাতেই এভাবে সম্পত্তি বন্টন করা জাইয আছে। যেমন কোন একটি সম্পত্তির সামনের অর্ধেকে দুই ব্যক্তি এবং অপর ব্যক্তি (তিন ব্যক্তি) শরীক। আর পেছনের অর্ধেকে শুধুমাত্র দুই ব্যক্তি শরীক। এতে আর কোন শরীক নেই। এই অবস্থায় উক্ত দুই শরীক ব্যক্তি যদি এইভাবে সম্পত্তি বন্টন করে যে, সামনের অর্ধেকে তাদের যা আছে তা এবং পেছনের এক চতুর্থাংশ এক জনে নিবে, তবে এ ধন জাইয হবে। (প্রথমত : যেভাবে জাইয) এমনিভাবে শেষের দিকেও এ ১. কোন একজনের অবিভাজ্য কিয়দংশের মালিক বের হয়ে আসার বিষয়টি উভয়ের অবিভাজ্য কিয়দংশের

মধ্যে মালিক বের হয়ে আসার মতই। ২. যেমন একটি বাড়ীতে যায়, সাজিদ এবং খালিদ, এই তিন ব্যক্তি শরীক। বাড়ীর সামনের অর্ধেকে তিন

জনই শরীক । কিন্তু পেছনের অর্ধেকে শুধুমাত্র যায় এবং খালিদ শরীক। এতে সাজিদের কোন অংশ নেই। এ অবস্থায় যায় এবং খালিদ যদি তাদের সম্পত্তি এভাবে বন্টন করে যে, সামনের অংশ পূর্ণটাই যায় নেবে এবং পেছনের অংশ থেকে ২ নেবে, অর্ধেক নয়। এভাবে বন্টনের ফলে মাসআলার ধরন এরূপ হলো যে, যায় এবং সাজিদ সামনের অর্ধেকের আধাআধির অংশীদার হলো। আর পেছনের অর্ধেকের মধ্যে খালিদের ৪ এবং যাদের ৪ অংশ হলো। উল্লেখ্য যে, এভাবে কটন করা জাই। এতে পৃথক করণের বিষয়টিও বহাল আছে। কাজেই যেমনিভাবে প্রথম অবস্থায় বন্টন করা জাইয, ঠিক এপ শেষ অবস্থায়ও বন্টন করা জাইয হবে।

আল-হিদায়া জাতীয় লেন-দেন করা জাইয়। এ হিসাবে উক্ত মাসআলাটি নির্দিষ্ট অংশে মালিক বের হয়ে আসার মতই হয়ে গেল। পক্ষান্তরে উভয় শরীকের অবিভাজ্য অংশে মালিক বের হয়ে এলে এর হুমুমের থেকে ব্যতিক্রম হবে। কেননা, এ অবস্থায়ও যদি বন্টনকে বহাল তথা কার্যকরী রাখা হয়, তাহলে তৃতীয় ব্যক্তির অবশ্যই ক্ষতি হবে। (এ অবস্থায় তার অংশ পূর্বের দুই শরীকের অংশের মধ্যে ছড়িয়ে থাকার কারণে। কিন্তু আলোচ্য মাসআলায় নতুন মালিকের কোন ক্ষতি নেই। কাজেই এ দুটি মাসআলার মধ্যে ব্যবধান সুস্পষ্ট।

সূরতে মাসআলা (মাসআলার প্রকৃতি বা ধরন) হলো এই যে, যখন শরীক দুই জনের একজনে বাড়ীর সামনের এক তৃতীয়াংশ নিল এবং অপরজনে নিল পেছনের অংশের দুই তৃতীয়াংশ, আর এই উভয় অংশের মূল্য হচ্ছে সমান, এ অবস্থায় কেউ সামনের ভাগের অর্ধেক অংশের মালিকানা দাবী করলো, তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে উক্ত ব্যক্তি (সামনের ভাগের মালিক যায়দ) ইচ্ছা করলে এ বন্টনকে নাকচ করে

দিতে পারবে– অধিক ভাগাভাগি করার ত্রুটিকে দূরীভূত করার লক্ষ্যে। আর ইচ্ছা করলে সে এ বন্টনকে বহাল রেখে, যে অংশীদারের ভাগে পেছনের অংশ পড়েছে, তার সে অংশ থেকে এক চতুর্থাংশ ফেরৎ নিয়ে নেবে। কেননা, সামনের পূর্ণ অংশের মালিক বের হয়ে এলে, সে ঐ ব্যক্তির দখলে যে পরিমাণ আছে। তার অর্ধেক ফেরৎ নিয়ে নিত। যেহেতু সামনের ভাগের অর্ধেকের মালিক বের হয়ে এসেছে, কাজেই সে তার অপর সাথীর দখলে যা আছে এর অর্ধেকের অর্ধেক তথা এক চতুর্থাংশ ফেরৎ নিয়ে নেবে। অংশ বিশেষকে পূর্ণ বস্তুর উপর কিয়াস করে এ বিধান দেওয়া হয়েছে। । সম্মুখ ভাগের মালিক ব্যক্তি তার অংশের অর্ধেক বিক্রি করে দেওয়ার পর যদি অবশিষ্ট অর্ধেকের নতুন কোন মালিক বের হয়ে আসে তাহলে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে উক্ত (সম্মুখ ভাগের মালিক) ব্যক্তি পেছনের অংশের মালিকের নিকট থেকে এক চতুর্থাংশ ফেরৎ নিয়ে নেবে। এর কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আর প্রথমোক্ত মাসআলায় বন্টন নাকচ করে দেওয়া বা না দেওয়ার ব্যাপারে তার যে ইখতিয়ার ছিল, সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রি করে দেওয়ায় তার সে ইখতিয়ার এখন আর থাকবে না; বরং রহিত হয়ে যাবে ।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে এ অবস্থায় তার অপর সাথীর দখলে যে সম্পত্তি রয়েছে, তা তারা আধাআধি করে পাবে। আর সম্মুখের অংশ যা বিক্রি করা হয়েছে এর অর্ধেক মূল্য সম্মুখ ভাগের মালিক– পেছনের ভাগের মালিক ব্যক্তিকে জরিমানা স্বরূপ ফেরৎ দিয়ে দেবে। কেননা, ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে, যে বন্টন কার্য পূর্বে সম্পাদন করা হয়েছিল, তা ফাসিদ হয়ে গেছে। তা সত্বেও ফাসিদ আকদের ভিত্তিতে যে মূল্য হস্তগত হয়, তা যেহেতু 313 হিসাবে গণ্য হয় অর্থাৎ তাতেও যেহেতু মালিকানা

১. কাজেই একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করা ঠিক নয়।

প্রতিষ্ঠিত হয়, সেহেতু এতেও ক্রয়-বিক্রয়ের হুকম কার্যকরী হবে। আর তা হলো বিক্রীত মূল্যের জরিমানা প্রদান করা । কাজেই তাকে তার অপর শরীক ব্যক্তির অ ঐশের জরিমানা পরিশোধ করতে হবে।। । ইমাম কুদরী (র) বলেন : (মত ব্যক্তির পরিত্যাজ্য) সম্পত্তি (ওয়ারিসদের মধ্যে) বন্টন হয়ে যাওয়ার পর পরিত্যাজ্য সম্পত্তির উপর যদি এমন ঋণের কথা প্রকাশ হয়, যা পুরা সম্পত্তি গ্রাস করে নেয়, তাহলে পূর্ব বন্টন রদ তথা বাতিল করে দেওয়া হবে। কেননা, এ ঋণ ওয়ারিসদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। এমনি ভাবে ঋণ যদি তার সমুদয় মাল গ্রাস করে না নেয়, তাহলেও, (বন্টন বাতিল করে দেওয়া হবে। কেননা, পাওনাদারদের হক এ সম্পত্তির সাথে যাওয়ার পরও এ পরিমাণ সম্পত্তি বাকী থাকে, যা-দ্বারা পাওনাদারদের ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব, তাহলে বন্টন বাতিল হবে না। কেননা, এ অবস্থায় পাওনাদারদের হক তথা পাওনা পরিশোধ করার জন্য কৃত বন্টন বাতিল করার কোন দরকার নেই।

বন্টনের পর যদি পাওনাদারগণ তাদের পাওনা মাফ করে দেয় অথবা ওয়ারিসগণ যদি তাদের মাল থেকে ঋণ পরিশোধ করে দেয়, চাই ঋণ পূর্ণ সম্পত্তি গ্রাস করে নেক বা না নেক, এ অবস্থায় বন্টন জাইয হবে। কেননা, বন্টনের ক্ষেত্রে যা প্রতিবন্ধক ছিল, তা শেষ হয়ে গেছে। যদি বন্টন প্রার্থীদের একজন পরিত্যাজ্য সম্পদে ঋণ আছে বলে দাবী করে, তবে তার দাবী সহীহ হবে। কেননা, এতে (প্রথমে সম্পদ বন্টন করা ও পরে ঋণের দাবী করাতে) কোন বৈপরিত্য নেই। কারণ ঋণের সম্পর্ক হলো পরিত্যাজ্য সম্পদের মালিয়াতের সাথে। আর বন্টনের সম্পর্ক হলো পরিত্যাজ্য সম্পদের বাহ্যিক অবস্থার সাথে ।

যদি ওয়ারিসদের কোন একজন পরিত্যাজ্য সম্পত্তির মধ্যে নির্দিষ্ট কোন একটি মালের মালিকানা দাবী করে, তা যে কোন উপায়েই হোক না কেন, তাহলে তার কথা গ্রাহ্য হবে না। কেননা, এ ক্ষেত্রে তার দাবী ও কর্মে বৈপরিত্য রয়েছে। কেননা, বন্টনের ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়ার মধ্যে এ কথার স্বীকারোক্তি রেয়েছে যে, যে মাল বন্টন করা হয়েছে, তা শরিকী মাল ।(একক কারো মাল নয়। কাজেই তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।)

=

১. কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর সে যদি পরিত্যাজ্য সম্পদ রেখে যায়, তবে এর দ্বারা প্রথমে তার (মৃত ব্যক্তির) দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা হবে। এরপর সে ঋণগ্রস্ত হয়ে থাকলে তার ঋণ পরিশোধ করা হবে। তারপর অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশের দ্বারা তার অসিয়ত বাস্তবায়িত করা হবে। এরপর যদি আরো সম্পদ বাকী থাকে, তবে তা ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হবে। এটাই হলো মৃত ব্যক্তির পরিত্যাজ্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান ! তা সত্বেও কেউ মারা যাওয়ার পর যদি ওয়ারিসগণ তার সমুদয় সম্পত্তি বন্টন করে নেয়, এরপর জানা যায় যে, তার যিম্মায় ঋণ আছে, এ অবস্থায় দেখতে হবে, ঋণ তার পূরা সম্পত্তি গ্রাস করে নেয় কিনা? উপরোক্ত দুই অবস্থাতেই বন্টন বাতিল করে দিতে হবে । প্রথমোক্ত অবস্থায় এই পরিত্যাজ্য সম্পত্তির সাথে ওয়ারিসদের হক সম্পর্কিত না হওয়ার কারণে, আর শেষোক্ত অবস্থায় এই সম্পত্তির সাথে পাওনাদারদের হক সম্পর্কিত হওয়ার কারণে। অবশ্য সম্পত্তি বন্টন করে নেওয়ার পরও যদি এ পরিমাণ সম্পদ অ বন্টিত অবস্থায় থাকে, যা-দ্বার পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করা সব, তাহলে এ অবস্থায় বন্টন বাতিল করার প্রয়োজন হবে না। বরং এ অবস্থায় বন্টন বহাল থাকবে।

brbr

পরিচ্ছেদ : মুহায়াত -এর বিবরণ।

প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ইসতিহসান এর ভিত্তিতে লাভ, মুনাফা এবং সুবিধা সমূহ বন্টন করে নেওয়া জাইয। কেননা, অনেক সময় সমষ্টিগত ভাবে মুনাফা বা সুবিধা। হাসিল করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ কারণেই এতে বিচারক বল প্রয়োগ করতে পারেন, যেমন বল প্রয়োগ করতে পারেন তিনি বন্টনের ক্ষেত্রে। তবে এদুয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, মুনাফা হাসিলের তাকমীল(পূর্ণতা অর্জন) এর ক্ষেত্রে বন্টনের বিষয়টি অধিক শক্তিশালী। কেননা, বন্টনের মধ্যে একই সময়ে সমুদয় মুনাফাকে একত্রিত করা হয়। আর L এর মধ্যে মুনাফাকে একত্রিত করা হয় পর্যায়ক্রমে। যেহেতু বন্টনের বিষয়টি L থেকে অধিক শক্তিশালী। এ কারণেই যদি দুই শরীকের কোন একজন বন্টনের দাবী করে

এবং অপর জন L প্রার্থনা করে, তাহলে বিচারক (L না করে) তাদের সম্পত্তি বন্টন করে দেবেন। কেননা, বন্টনের বিষয়টি (লাভালাভের)। পূর্ণতা বিধানের ক্ষেত্রে অধিক কার্যকরী।

যদি বন্টনযোগ্য সম্পত্তিতে 'L2,' করা হয়, এরপর শরীকদের কোন একজন বন্টনের দাবী করে, তবে সম্পত্তি বন্টন করে দেওয়া হবে এবং L' বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, লাভ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বন্টনের বিষয়টি অধিক কার্যকর। শরীকদের কোন এক জনের মারা যাওয়ার কারণে বা উভয়ের মারা যাওয়ার কারণে 'L4 বাতিল হবে না। কেননা, যদি 'L' বাতিল হয়ে যায়, তাহলে বিচারক তা আবার নতুন করে করবেন। অথচ একবার ভঙ্গ করে আবার নতুন ভাবে মুহায়াত করাতে কোন লাভ নেই।

কোন বাড়ীতে দুইজন শরীক আছে। তারা যদি পরস্পর এভাবে মুহায়াত করে যে, সে বাড়ীর এ অংশে থাকবে এবং অপরজন অন্য অংশে থাকবে, অথবা সে উপর তলায় থাকবে এবং অপরজন নীচ তলায় থাকবে, তবে তা জাইয হবে। কেননা, এভাবে মূল সম্পত্তি বন্টন করা জাইয, কাজেই এভাবে 'L' (মুনাফা বন্টনও) জাইয হবে। উল্লেখ্য যে, এ প্রক্রিয়ায় করার মর্ম হলো সমুদয় অংশকে পৃথক করে দেওয়া। মূলত: এটি সম্পদের তথ্য বিনিময় নয়। এ কারণেই এতে 55' তথা সময় নির্দিষ্ট করণ শর্ত নয়।

মুনাফা বন্টনকারী প্রত্যেক অংশীদারের এই হক থাকবে যে, তারা মুহায়াতের মাধ্যমে যা প্রাপ্ত হয়, তা অন্যের নিকট ভাড়া দিতে পারবে, চাই মূল আকদের মধ্যে ভাড়া দেওয়ার কথা শর্ত হিসাবে উল্লেখ করা হোক বা না হোক। কেননা, ১. মুহায়াত (L) বাবে মুফা'আলার (LaL) ক্রিয়ামূল। আর তাহায়, () Li' এর ক্রিয়ামূল। এর অর্থ হলো লাভ, মুনাফা এবং সুবিধাসমূহ বন্টন করে নেওয়া। প্রথমে গ্রন্থকার (র) মূল সম্পত্তি ও বস্তুর বন্টন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সে আলোচনার পর তিনি মুনাফা ইত্যাদির বন্টন সম্পর্কিত আলোচনা এখানে করেছেন। কেননা, এদুয়ের মধ্যে একটি মূল ও অপরটি শাখার মর্যাদা রাখে। তাই প্রথমে তিনি মূল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

অধ্যায় : বন্টনের মাসাইল

৮৯ প্রত্যেকের মালিকানায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবেই মুনাফা হাসিল হয়ে থাকে। (তাই তারা তা ভাড়াও দিতে পারবে।)। যদি দুই (শরীক) ব্যক্তি কোন এক গোলামের ব্যাপারে এইভাবে? ' তথা পালা বন্টন করে যে, সে এক দিন তার খিদমত করবে এবং দ্বিতীয় দিন অপর জনের খিদমত করবে, তবে তা জাইয হবে। অনুরূপভাবে ছোট ছোট কামরার ক্ষেত্রেও এভাবে ৫ (পালা বন্টন) করা জাইয। কেননা, কখনো সময়ের হিসাবে হয়, আবার কখনো স্থানের হিসাবে হয়। এখানে প্রথমটিই নির্দিষ্ট। | 43 সময়ের হিসাবে হয়েছে না স্থানের হিসাবে হয়েছে, এ ব্যাপারে যদি দুই অংশীদারের মধ্যে মতভেদ হয় এমন বস্তুর ক্ষেত্রে, যাতে উভয়টিরই সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে বিচারক উভয়কে নির্দেশ দেবেন, যাতে তারা পরপর একমত হয়ে যায়। কেননা, যদি স্থানের পালা বন্টন করা হয়, তবে তা হবে খুবই ইনসাফপূর্ণ কাজ। আর যদি সময়ের হিসাবে পালা বন্টন করা হয়, তবে এতে মুনাফা হাসিল হবে পূর্ণাঙ্গ ভাবে। (অর্থাৎ এ অবস্থায় সে পূর্ণ ঘর বা কামরা থেকে একাই ফায়দা হাসিল করতে সক্ষম হবে।)।

আর যখন বন্টনের দিক এবং অবস্থার ব্যাপারে মতভেদ হয়ে গেছে তখন এ ক্ষেত্রে তাদের পরস্পরের ঐক্যমত হচ্ছে অপরিহার্য। যদি সময়ের হিসাবে তারা "45 কে গ্রহণ করে নেয়, তবে প্রথমে কে ব্যবহার করবে, তা নির্ধারণের জন্য লটারীর ব্যবস্থা করা হবে, অপবাদ থেকে বাঁচার লক্ষ্যে। যদি দুই (শরীক) ব্যক্তি দুইজন গোলেমের ব্যাপারে এভাবে মুনাফা বন্টন করে যে, এই গোলাম অমুকের খিদমত করবে এবং ঐ গোলাম অমুকের খিদমত করবে, তবে সাহেবায়নের মতে এভাবে পালা বন্টন জাইয আছে। কেননা, তাদের মতে বিচারক কর্তৃক বল প্রয়োগ করে অথবা তাদের স্বেচ্ছা সম্মতিক্রমে এভাবে বন্টন করা যেহেতু জাইয, কাজেই এভাবে পালা বন্টনও জাইয হবে। কেউ কেউ বলেন : ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে বিচারক এভাবে বন্টন করবেন না, আর ইমাম আবু হানীফা (র) হতে এভাবেই বর্ণিত রয়েছে। কেননা, তাঁর মতে এ জাতীয় মুনাফা বন্টনের ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করা যায় না।

কিন্তু বিশুদ্ধতম বর্ণনায় ইমাম আবু হানীফা (র) এর অভিমতও হচ্ছে এই যে, বিচারক তা বন্টন করে দেবেন। কেননা, খিদমতের মুনাফার মধ্যে সাধারণত: কম ব্যবধানই হয়ে থাকে। কিন্তু গোলামের মূল সত্তার বিষয়টি হলো এ হুম থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, এ ক্ষেত্রে খুব বেশী ব্যবধান হয়ে থাকে। যেমন এ সম্পর্কে পূর্বেও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

যদি দুই ব্যক্তি গোলাম দুটির ব্যাপারে এভাবে করে যে, যে যাকে নেবে সে-ই তার খানা-পিনার ব্যবস্থা করবে, তবে তা জাইয আছে। এটি ইসতিহসান (সূক্ষ কিয়াস) এর কথা। কেননা দাস-দাসীকে আহার করানোর ব্যাপারে লোকেরা

১। যে যে জিনিস বন্টন করা জাই এবং যে যে জিনিস বন্টন করা জাই নয়, অনুচ্ছেদে।

সাধারণতঃ বদান্যতা প্রদর্শন করে থাকে। কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদের শর্ত করণের বিষয়টি পূর্ব হুকুম থেকে ব্যতিক্রম। কেননা পোশাকের ব্যাপারে লোকেরা সাধারণত বদান্যতা প্রদর্শন করে না ।

যদি দুই ব্যক্তি দু'টি বাড়ীর ব্যাপারে এ মর্মে ' (মুনাফা বন্টন) করে যে, তাদের প্রত্যেকে এক একটি বাড়ীতে বসবাস করবে, তবে তা জাইয হবে। আর এ ব্যাপারে বিচারক তাদেরকে বাধ্যও করতে পারবেন। সাম্বোইনের মতে তো এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট। কেননা সাহেবাইনের মতে দু'টি বাড়ী একই বাড়ীর অনুরূপ। কেউ কেউ বলেন ঃ ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে এ বিষয়েতাদেরকে বাধ্য করা যাবে না। এ বিষয়টিকে তিনি বন্টনের বিষয়ের উপর কিয়াস করেছেন । অপর এক বর্ণনায় ইমাম আবু হানীফা (র) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, দুই বাড়ীর ব্যাপারে মুহায়াত আদৌ জাইয নয়। বল প্রয়োগ করেও জাইয নয়। ঐ দলীলের ভিত্তিতে, যা পূর্বে আমি বর্ণনা করেছি। অনুরূপভাবে পারস্পরিক সম্মতি থাকলেও জাইয হবে না। কেননা এটি হলো 'k'o' (বসবাস) এর বিনিময়ে :২.' (বসবাস) এর

ক্রয়-বিক্রয়। পক্ষান্তরে মূল বাড়ী দু'টির বন্টনের মাসআলা এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা মূল বাড়ী দুটির কোন একটিকে অপরটির বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা জাইয। । যাহিরী রিওয়ায়েতে যে মতামত উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার যুক্তি হলো ঃ মুনাফার মধ্যে সাধারণত : ব্যবধান খুব কমই হয়ে থাকে। কাজেই পরস্পর সম্মতির অবস্থায় এর বন্টন জাইয হবে এবং এতে বিচারক বল প্রয়োগও করতে পারবেন। আর একে । তথা পৃথককরণ বলেও গণ্য করা হবে। অবশ্য মূলগত দিক থেকে বাড়ী দুটির মধ্যে ব্যবধান যেহেতু বেশী, এ কারণে এ পর্যায়ে একে ' তথা বিনিময় বলে গণ্য করা হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে সওয়ার হওয়ার ব্যাপারে দুই পশুর ক্ষেত্রে LG (মুনাফা বন্টন) করা জাইয নয়। কিন্তু সাহেবাইনের মতে জাই। তারা মূল বস্তুর বন্টনের উপর কিয়াস করে এ কথা বলেন।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল হলো ঃ আরোহীর বিভিন্নতার কারণে ব্যবহারের মধ্যেও বিভিন্নতা এসে যায়। কেননা কোন কোন আরোহী বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ, আবার কোন কোন আরোহী হচ্ছে আনাড়ী বা বোকা।

একই পশুর উপর সওয়ার হওয়ার ব্যাপারে –করাতেও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। এর কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। গোলামের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা গোলাম তো নিজ ইখতিয়ারে খিদমত করে। কাজেই সে তার ক্ষমতা বহির্ভূত অতিরিক্ত খিদমতের বিষয়টি সহ্য করে নেবে না। পক্ষান্তরে পশু

অতিরিক্ত খিদমতের বিষয়টি সহ্য করে নিতে বাধ্য। । যাহিরী রিওয়ায়েতের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট একটি বাড়ী কিরায়া দেওয়ার ব্যাপারে L+' করা জাইয। কিন্তু একজন গোলাম বা একটি পশুকে এভাবে কিরায়া দেওয়ার